শুকতারা

উনত্রিংশ বর্ষ
তৃতীয় সংখ্যা
বৈশাখ•১৩৮৩

সর্পরাজের দ্বীপে

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সঙ্ঘামিত্রা সরকার
স্ক্যান করেছেন - সঙ্ঘামিত্রা সরকার
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্র পত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিয়ে চান বা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

রাম আর শ্যাম
—কুখ্যাত স্মাগলারদের পাকড়াল।
সন্ধ্যাবেলায় রাম আর শ্যাম বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। লোকগুলোর ভাবগতিকে সন্দেহ হচ্ছিল ॥
"দেখেছিস্ রাম ? মনে হচ্ছে, লোকটা চোর নয়। স্মাগলারদের সর্দ্দার ও হবেই নিশ্চয় ॥"
"ইন্সপেক্টর আপনি আসুন এই দিকটা দিয়ে। চটপট ঐ স্মাগলারদের ধ'রে ফেলুন গিয়ে॥"
ছুটতে গিয়ে স্মাগলারেরা পিছলে যাচ্ছে পড়ে। পায়ের নীচের মাটি তাদের যাচ্ছে যেন সরে ॥
"ওদের পায়ের তলায় পপিন্স দিয়েছিলাম ফেলে। সবাই মিলে এখন মজায় খাব প্যাকেট খুলে ॥"
PARLE POPPINS MIXED FRUITY SWEETS
খেতে ভাল দেখতে ভাল ভাবতে ভাল
পার্লে পপিন্স
পাঁচটি ফলের স্বাদে ভরপুর—
রাস্পবেরী, আনারস, লেবু,
কমলালেবু এবং মৌসম্বী

বাঁটুল দি গ্রেট

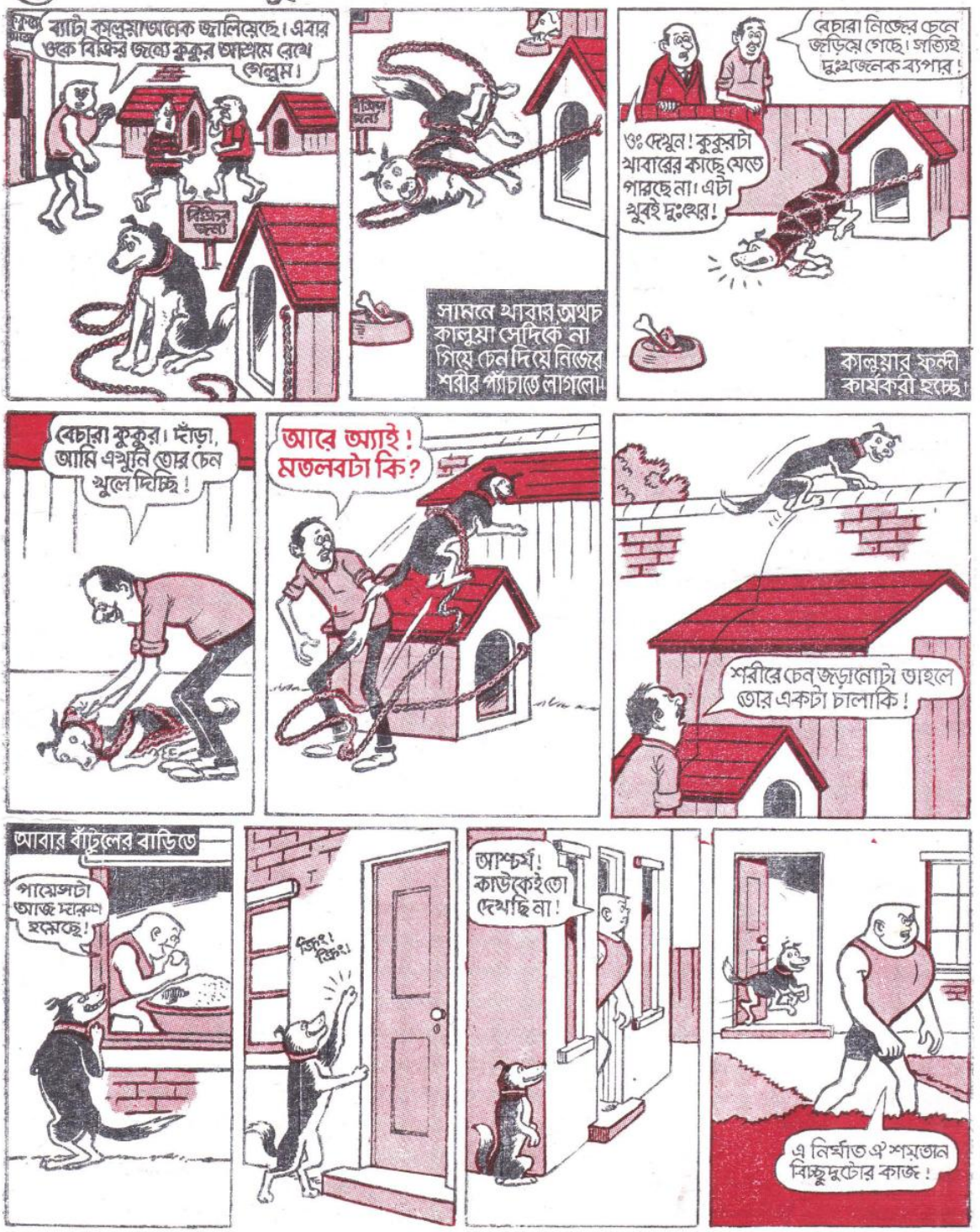

ব্যাটা কালুয়া অনেক জ্বালিয়েছে। এবার ওকে বিক্রির জন্যে কুকুর আশ্রমে রেখে গেলুম।
বিক্রির জন্য
সামনে খাবার অথচ কালুয়া সেদিকে না গিয়ে চেন দিয়ে নিজের শরীর প্যাঁচাতে লাগলো।
বেচারা নিজের চেনে জড়িয়ে গেছে। সত্যিই দুঃখজনক ব্যপার!
ওঃ দেখুন! কুকুরটা খাবারের কাছে যেতে পারছে না। এটা খুবই দুঃখের!
কালুয়ার ফন্দী কার্যকরী হচ্ছে।
বেচারা কুকুর। দাঁড়া, আমি এখুনি তোর চেন খুলে দিচ্ছি!
আরে অ্যাই! মতলবটা কি?
শরীরে চেন জড়ানোটা তাহলে তোর একটা চালাকি!
আবার বাঁটুলের বাড়িতে
পায়েসটা আজ দারুণ হয়েছে!
ক্রিং! ক্রিং!
আশ্চর্য! কাউকেই তো দেখছি না!
এ নির্ঘাত ঐ শয়তান বিচ্ছুদুটোর কাজ!

ক্লিক্!
অদ্ভুত তো! আমার পেছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেলো! দরজা ভেঙে না খুলে—
তার বদলে দেয়ালে একটা গর্ত করে নি—
যদাস!
তারপর চাবি ঘুরিয়ে দরজাটা খুলি!
ক্লিক্!
একি, আমার পায়েস হাওয়া!
এই যে, তোদেরই কাজ! তোরাই আমার পায়েস মেরে দিয়েছিস! কারণ এবার আর কালুয়া নেই!
না বাঁটুলদা, সত্যি বলছি তোমার পায়েস আমরা খাইনি!
উঁহু! শাস্তি তোদের পেতেই হবে— কে?
বাঁটুল! তোমার কুকুর, কুকুর আশ্রম থেকে পালিয়ে এসেছে!
হতচ্ছাড়া কুকুর ওখান থেকে পালিয়েছে! তাহলে ওই আমার পায়েস সাঁটিয়েছে! কিন্তু কোথায় সে?
কালুয়া-আ আ! তুই কোথায় রে-এ-এ এ?

"শুকতারা"

Approved by the Directorate of Public Instruction, West Bengal as Children's Monthly Magazine Vide, No 321 (9)-T B C

(Dated 14th August, 1971, 2B-20G/71)

সূচীপত্র—বৈশাখ, ১৩৮৩

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১।	সর্পরাজের দ্বীপে (সচিত্র চিত্র-কাহিনী)	—নারায়ণ দেবনাথ	প্রচ্ছদপট
২।	বাঁটুল দি গ্রেট	—নারায়ণ দেবনাথ	প্রথম ছবি
৩।	আদুরী-উদর (কবিতা)	—শ্রীপুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬৩
৪।	স্যামুয়েল ফিনলে মোর্স (জানবার কথা)		১৬৪
৫।	গুর্জরেশ্বর গজকেশরী (অমর বীর কাহিনী)	—শ্রীমধুসূদন মজুমদার	১৬৫
৬।	গুগলিয়েমো মার্কনি (জানবার কথা)		১৭২
৭।	বীরতীর্থ (বিদেশী গল্প)	—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা	১৭৩
৮।	ছাব্বিশ ভায়ের কাহিনী (গল্প)	—শ্রীবলরাম দাস	১৭৯
৯।	ঘুঘুর ভাই ফাঁদ (ছবিতে গল্প)	—মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায় ...	১৮২
১০।	জীবন কোথায় নেই ? (বৈজ্ঞানিক গল্প)	—শ্রীবৈজ্ঞানিক	১৮৪
১১।	সূর্যের চাঁদ (জানবার কথা)		১৯০
১২।	কথা কেনা (গল্প)	—শ্রীবরুণকুমার চক্রবর্তী ...	১৯১
১৩।	মজার ছবি		১৯৪
১৪।	রবটকুমার (গল্প)—নারায়ণ চক্রবর্তী		১৯৫
১৫।	অদ্বিতীয় সার্জেন (কার্টুন)	—দিলীপ দাস	২০১
১৬।	যুগে যুগে (ছবিতে গল্প)	–দিলীপ দাস	২০২
১৭।	বুদ্ধির জোরে (গল্প)—গৌতম গুপ্ত		২০৪
১৮।	বীর ছেলে বাংলার (ধারাবাহিক উপন্যাস)	—সুধীন্দ্রনাথ রাহা	২০৬
১৯।	পৃথিবীর যমজ গ্রহ (জানবার কথা)		২১২
২০।	শিবাজীর ঠাকুর্দা (জীবন কথা)	পূরবী দেবী	২১৩
২১।	"৺বিভাবতী চ্যাটার্জী স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিত" (ঘোষণা)		২১৮
২২।	মরণ যারা করল বরণ (প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা)—পীযূষকান্তি দত্ত ...		২১৯
২৩।	সাবধান থাকাই ভাল (রিপ্লে থেকে)		২২৩
২৪।	হাঁদা-ভোঁদার স্ট্যাম্প অ্যালবাম (ছবিতে গল্প)		২২৪
২৫।	একটি নির্ভীক মেয়ের বীরত্বের কাহিনী (দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা)—বিশন মিত্র		২২৬
২৬।	ভূতুড়ে প্রাসাদ (সত্য কাহিনী)	—নিরঞ্জন সিংহ	২৩০
২৭।	মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) ...		২৩৪
২৮।	টারজানের বেশে (খেলাধুলা)	—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩৬
২৯।	মাঘ সংখ্যার ধাঁধার উত্তরদাতাদের নাম		২৩৮
৩০।	ছোটদাদুর প্রয়াণে (শোক সংবাদ)		২৩৯

এস. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ ৬৮, কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ১১নং ঝামাপুকুর লেন কলিকাতা হইতে শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীমধুসূদন মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য ১'২৫

টিনোপালে*র নতুন নাম

রানীপাল+

সূতীর কাপড়ের জন্যে
রানীপাল+

ব্লেণ্ডেড ও সিন্থেটিক
কাপড়ের জন্যে
রানীপাল+-এস

সেই জিনিষ, সেই কাজ, নতুন নামে এল আজ

সবচেয়ে সাদা করার জন্যে রানীপাল+

Suhrid Geigy LIMITED

+ সুহৃদ গায়গী লিমিটেডের ট্রেডমার্ক   * সিবা-গায়গী লিমিটেডের লাইসেন্স'এর অধীনে এতকাল বাজারে বিক্রী হয়েছে।

Shilpi SGT 6/76 ben

ঊনত্রিংশ বর্ষ ● ৩য় সংখ্যা ● ১৩৮৩, বৈশাখ

আদুরী-উদর

শ্রীপুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

এ কেমন দেশে এলাম এইতো খেলাম
আবার ক্ষিদে পায়
উদরের মাপটা আমার পেট ছাড়িয়ে
পৌঁছে গেছে পায়।
প্রাতঃরাশ সাতটা কলা আটটা রুটি
পাঁচ পাঁচখানা ডিম
জানিনা এর চেয়ে কী বেশী খেতেন
মহাভারতের ভীম
বেলা যেই পড়িয়ে এলো ওমনি পেটে
ইঁদুরে লাফ খায়!
উদরের মাপটা আমার পেট ছাড়িয়ে
পৌঁছে গেছে পায়!

দুপুরে গোটা ইলিশ তিনটি মাগুর
চার চারখানা কই
তার ওপর শেষ পাতেতে তিনশো বোঁদে
আড়াই হাঁড়ি দই ;
বিকেলে দশ কাপ চা সাত ল্যাংচা
খান এগারো আম
হয়তো এখন থেকেই আমিও পাবো
ভীম-গদাধর নাম
রাতে তাই তাকিয়ে দেখি পেটের ভেতর
পেটটা ঢুকে যায়
এতো খায় প্রাণটা তবু ঢেঁকুর তুলেই
আবার খেতে চায় !!

স্যামুয়েল ফিনলে মোর্স

"মোর্স কোড"-এর কথা অনেকেই জানেন। এ একটা সাংকেতিক লিখন-পদ্ধতি, এর সাহায্যেই বৈদ্যুতিক মাধ্যমে তারবার্তা পাঠানো হয় এক স্থান থেকে স্থানান্তরে।

এই পদ্ধতির, এবং সামগ্রিকভাবে টেলিগ্রাফেরই আবিষ্কারক সামুয়েল মোর্স-এর জন্ম হয় ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসচুস্টেস রাজ্যে অবস্থিত চার্লসটাউনে। শুনতে আশ্চর্য লাগে, উত্তরকালে বিশ্ববন্দিত এই বিজ্ঞানী জীবন আরম্ভ করেন চিত্রকর হিসাবে।

সেযুগে ঘোড়ার চেয়ে দ্রুতগামী বাহন কিছু ছিল না। দূরদেশে খবর কতদিনে পৌছোবে, তা নির্ভর করত অশ্বারোহী দূতের ধাবনশক্তির উপরে। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্যারি শহরে একদিন বন্ধুসমাজে বৈঠকী আলাপ সূত্রে মোর্স হঠাৎ বলে ওঠেন—"বিদ্যুতের সাহায্যে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারলে তার চেয়ে ভাল কথা আর কিছু হতে পারে না।"

না-ভেবে-চিন্তেই কথাটা তিনি বলে ফেলেছিলেন, ভাবনা চিন্তা শুরু করলেন বলার পরে। শুধু ভাবনা চিন্তা নয়, তোড়জোড় প্রস্তুতিও। ছবি এঁকে দু' পয়সা রোজগার হচ্ছিল, সেকাজ বন্ধ করে টেলিগ্রাফের উদ্ভাবনে কায়মন উৎসর্গ করে দিলেন। সাফল্য আসতে লেগে গেল দীর্ঘ দশ বৎসর। তার পরেও মামলা মোকদ্দমা চলল ঢের দিন। আরও কয়েকজন এসে দাবি করলেন—"পরিকল্পনা আমার" বলে। শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত মোর্সের দাবিই মেনে নিলেন। এইবার সুখ সৌভাগ্যের মুখ দেখতে পেলেন তিনি।

তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে।

গুর্জরেশ্বর গজকেশরী

শ্রীমধুসূদন মজুমদার

মুলতান অধিকার করেছেন শিহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী।

ছিল সেখানে মুসলমানেরই অধিকার আগেও, তবে তারা ইস্মাইলী মতের মুসলমান। গোঁড়াদের বিবেচনায় প্রায় কাফের-মধ্যেই গণ্য। লাহোরে ঘাঁটি গেড়ে বসবার পরে মহম্মদ ঘোরী দেখলেন উত্তরে পুবে দক্ষিণে সর্বত্রই তাঁকে বেষ্টন করে আছে এমন সব হিন্দু রাষ্ট্র, ঐক্যবদ্ধ না হলেও বিচ্ছিন্ন-ভাবেই যারা প্রত্যেকে সমানে সমানে লড়াই দিতে পারে তাঁকে। হঠাৎ তাঁদের কাউকে ঘাঁটানো সমীচীন মনে হল না ঘোরীর।

থাকুক তারা আরও দু'দিন। ঐ জম্মুর বিজয়দেব, ঐ দিল্লীর চৌহান পৃথ্বীরাজ, ঐ মেবারের গেহ্‌লোট সমরসিংহ। থাকুক, ওদের সঙ্গে বোঝা-পড়ার সময় এখনও আসেনি। সর্বাগ্রে খতম করা যাক ঐ মুলতানী ইস্মাইলীগুলিকে, তাতে রাজ্য-বিস্তারও হবে, আবার মুসলিম জগতে খাঁটি মুসলমান বলে প্রতিপত্তিও লাভ করা যাবে অনেকখানি।

মুলতান সহজেই করায়ত্ত হল। বিজয়গর্বে দুর্গে প্রবেশ করে অর্ধচন্দ্র বিজয় পতাকা উড়িয়ে দিলেন ঘোরী। গজনীপতি ঘিয়াসুদ্দিন ঘোরীর নাম সগৌরবে ঘোষিত হল মুলতানের নব-নরপতি রূপে। শিহাবুদ্দিনের অগ্রজ এই ঘিয়াসুদ্দিন। নির্মম অত্যাচারী, বিবেকহীন, পরস্বাপহারী বলে যতই কুখ্যাতি থাকুক শিহাবুদ্দিনের, ঐ একটি অসাধারণ গুণ তাঁর ছিল। অগ্রজের জীবদ্দশায় তাঁর প্রতি বরাবর তিনি পরিপূর্ণ আনুগত্য জ্ঞাপন করে এসেছেন, নিজে সমসাময়িক মুসলিম দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সেনাপতি বলে স্বীকৃত হয়েও।

যা হোক, মুলতান অধিকৃত হয়েছে। সিন্ধু দেশটার সামান্য অংশই অবশ্য এতাবৎকাল মুলতানের শাসনাধীনে ছিল, কিন্তু ঘোরীর আশা আছে যে, তাঁর আমলে পূর্বাবস্থা শীঘ্রই পালটে যাবে। তবে হঠাৎই কোনদিকে আক্রমণ করে বসা ঠিক হবে না, সিন্ধুর বাকী অঞ্চলগুলো খাঁটি গোঁড়া মুসলমানদের দ্বারাই অধ্যুষিত, তাদের উপর

হামলা চালাতে গেলে মহামান্য খলিফা বাগদাদ থেকে প্রতিবাদ পাঠাতে পারেন।

তবে কোন্‌দিকে বাহুপ্রসারণ করা যায় ?

দক্ষিণে ঐ সমৃদ্ধ দেশ গুজরাট। দেশটা আবার হিন্দুরাজ্য। ওখানে অভিযান চালনার ফলে ধর্ম অর্থ দুটোই লাভ হতে পারে। কাফের নিধনে পুণ্য আছে, রাজ্য লুণ্ঠনে অর্থ আছে। চল গুজরাট।

রাজার নাম গজকেশরী। পরাক্রান্ত রাজা বলেই জানে লোকে তাঁকে। কিন্তু মহম্মদ ঘোরী বিশ্বাস করেন না যে, তাঁর নিজের তুল্য পরাক্রম হিন্দুস্থানে কারও আছে। ধুলোয় মিশিয়ে দেব, হাওয়ায় উড়িয়ে দেব—এই তাঁর মুখের বুলি।

অলস হয়ে বসে থাকা মহম্মদ ঘোরীর স্বভাবেই নেই। তিনি সৈন্যসজ্জা করলেন গুর্জর আক্রমণের জন্য। ইস্মাইলী যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, কিন্তু যে কয়দিন লড়েছে, ইস্মাইলীরা মরিয়া হয়েই লড়েছে। বিস্তর সৈন্যক্ষয় করে গিয়েছে ঘোরীরও। বাধ্য হয়ে নতুন সৈন্য সংগ্রহ করতে হচ্ছে। সদ্যবিজিত মুলতানীদের গজনীর বাহিনীতে এখনই ঢোকানো বুদ্ধির কাজ হবে না। তাদের গায়ের জ্বালা এখনও ঠাণ্ডা হয়নি। যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বেইমানিও করতে পারে। সুতরাং সৈন্য আনতে হবে খাস কাবুল থেকে। দাদাকে বলাই আছে, শিহাবুদ্দিন বাইরে থাকলে, যেখানেই থাকুন, সেইখানেই তাঁর কাছে প্রতি ছয় মাস পরে পরে যথাসম্ভব নতুন সৈন্য পাঠাতে হবে যে কোন প্রকারে হোক। এবারকার কিস্তি আসন্ন।

ওরা এলে শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে। পার্বত্য অঞ্চলে যুদ্ধ করতে হলে শিক্ষা নিতে হয় একরকম, সমতলে লড়তে হলে অন্য রকম। শিক্ষাদাতা হিসাবে মহম্মদ ঘোরী নিজেই ওস্তাদ। তাহলেও অন্য শিক্ষাদাতাও নিয়োগ করেন তিনি। তাঁর পক্ষে সর্বদা শিক্ষকতা করার সময় করে ওঠা সম্ভব হয় না। তা ছাড়া একা কি আর দশ বিশ হাজারকে কিছু শেখানো যায় ?

এবার দুই একজন ওস্তাদ পেলে হত। কারণ সম্প্রতি নিয়ামত খাঁ আর আফতাব আলি দুজনেরই এন্তেকাল ঘটেছে। না লড়াইয়ে নয়। ঘোরী কখনও ওস্তাদদের যুদ্ধে নামতে দেন না। কারণ একটা সৈনিকের বদলে আর একটা সৈনিক সহজেই পাওয়া যায়, কিন্তু পাওয়া যায় না একটা ওস্তাদের জায়গায় আর একটা ওস্তাদ। পেতে দেরি হয়, কষ্ট হয়, পেয়েও আবার ছাড়িয়ে দিতে হয়, অবিশ্বাসী বলে সন্দেহ হলে। নিয়ামত খাঁর কথাই ধর না কেন। ওকে দেখা গেল যুদ্ধের ঠিক পরেই ইস্মাইলী পল্লীতে ঘোরাফেরা করতে ! ও বলল—আর্ত-সেবার জন্য গিয়েছিল। সে কথা কি আর বিশ্বাস হয় ? কোতল করতে হল লোকটাকে। আফতাব আলি অবশ্য সাপের কামড়ে মরেছে। এ-অঞ্চলে সাপের উৎপাত খুব।

তা, ওস্তাদ দুএকজন পেলে মন্দ হয় না।

মেঘ না চাইতেই জল। এক লম্বা চওড়া পালোয়ান একদিন এসে নোকরি চাইল। সে অস্ত্রশিক্ষক। জম্মুর লোক, জাত্যংশে হিন্দু, রাজা বিজয়দেবের চিঠি তার হাতে। বিজয়দেব সেবারে ঘোরীর যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন, লাহোর দখলের সময়। বস্তুতঃ সে-সাহায্য না পেলে সুলতান মামুদের বংশধরের হাত থেকে তার শেষ আশ্রয় লাহোর কেড়ে নেওয়া ঘোরীর পক্ষে সম্ভব হত কিনা, কে জানে।

কিন্তু মানুষটা হিন্দু যে ! ঘোরী এসেছেন হিন্দুর দেশ জয় করতে। এ সময় কোন হিন্দু যদি এসে স্বেচ্ছায় তাঁর সাহায্য করতে চায়, তার আন্তরিকতায় কে না সন্দেহ করবে ? বিজয়দেব ? তিনি সাহায্য করেছিলেন লাহোর থেকে এক

মুসলমানের দ্বারা আর এক মুসলমানকে উৎসাহ-দানের ব্যাপারে। যুদ্ধমান দুই পক্ষই যেখানে মুসলমান, সেখানে তৃতীয় পক্ষ হিন্দু হয়েও যেদিকে খুশী পক্ষপাত দেখাতে পারে। এ যেন বাঘ মারতে শত্রু পাঠানো। বাঘ মরলেও ভাল, শত্রু মরলেও ভাল।

কিন্তু এ ওস্তাদ কেমনধারা লোক? নিজে হিন্দু হয়েও—

মহম্মদ ঘোরীর বাহিনী হিন্দুরাজ্য জয়ের জন্য বেরুচ্ছে জেনেও—

সে এল কি না ঘোরীর সাহায্য করতে?

লোকটা জাতিদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী, দেশদ্রোহী। থাকুক, কাজে লাগানো যাক। তবে বিশ্বাস করা নয়। আর সর্বদা চোখা নজর রাখা। এধার-ওধার দেখলেই তরোয়ালের এক ঘায়ে মুণ্ডুটা উড়িয়ে দেওয়া। বাঘের ঘরে ঘোগ? দেখা যাক।

মহম্মদ ঘোরীর নোকরিতে ভরতি হল গজরাজ প্রমার। হ্যাঁ, নাম ওর গজরাজ, সার্থকনামা পুরুষ, গজবৎ বিপুল কলেবরের অধিকারী। আর প্রমার? প্রমারেরা উত্তর-পশ্চিম ভারতে অন্যতম প্রসিদ্ধ রাজপুত সম্প্রদায়। সেই গোষ্ঠীরই লোক ও।

দেখা গেল, লোকটা অস্ত্রশিক্ষা দেয় চমৎকার। জানে। তরোয়াল, ভল্ল এসব চালাতে জানে। এমন সব প্যাঁচ দেখায়, যা ঘোরী নিজেও দেখেননি কোনদিন। অবশ্য সে-সব প্যাঁচ সাধারণ সিপাহীদের শেখানোর কোন প্রশ্নই ওঠে না। শেখাতে গেলে সময় লাগবে অত্যধিক, আর অত্যধিক সময় দিলেও শতকরা একজনের বেশী কোনদিনই তা আয়ত্ত করে উঠতে পারবে না। সবচেয়ে বড় কথা, হাতাহাতি লড়াইয়ে এর কোন দরকার হয় না। সেখানে যে যাকে পারে, মারে।

তিন চার দিন ঘোরী লক্ষ্য করলেন এইসব প্যাঁচোয়া খেলা।

একা না পারলে দশ জনে মিলে একজনকে মারে। অন্য সবাইকে দূরে সরিয়ে দিয়ে দুটি মাত্র যোদ্ধা দ্বৈরথ যুদ্ধে ব্যাপৃত হয় না। অথচ দ্বৈরথের বেলাতেই সূক্ষ্ম প্যাঁচের দরকার বেশী।

গজরাজ যে না বোঝে একথা, তা নয়। সাধারণতঃ এসব খেল সে সিপাহীদের সামনে দেখায় না। দেখায় শুধু তখনই, যখন ঘোরী নিজে রঙ্গভূমিতে এসে প্রবেশ করেন, কুচকাওয়াজ দেখবার জন্য। কেমন শিক্ষা পাচ্ছে পলটন, এটা নিজের চোখে দেখা তাঁর চিরদিনের অভ্যাস।

তিন চার দিন ঘোরী লক্ষ্য করলেন এইসব প্যাঁচোয়া খেলা। তারপর একদিন রঙ্গভূমি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় গজরাজকে বললেন—"কাজ শেষ হলে তুমি দেখা করবে আমার সঙ্গে।"

গজরাজ কি পুরস্কারের আশায় উৎফুল্ল হল? না, তিরস্কারের আশঙ্কায় ত্রস্ত হয়ে উঠল?

কোনটাই না। জাহাপনাকে সেলাম বাজাবার সময় চোখের পাতাও কাঁপল না তার, মুখেরও রঙ ফ্যাকাশে মেরে গেল না। মালিককে বিদায় দিয়ে সে নিরুত্তাপ কণ্ঠে আগের মতই হাঁকতে লাগল—"আগু বাঢ়ো, এক, দো, খিঁচো কিরপান—"

ঘোরীর সঙ্গে দেখা যখন হল, "এসব কী হচ্ছে?" জিজ্ঞাসা করলেন ঘোরী। কণ্ঠস্বরকে পরুষ করবার জন্য চেষ্টা করলেও তার ভিতরে কাঠিন্যের রেশ তেমন ফুটল কই?

"জাঁহাপনা কোন্ সবের কথা বলছেন, বান্দার ত মালুম হচ্ছে না—"

"ঐ উঁচুদরের ওস্তাদী মার শিখে ওরা করবে কী? আর শিখতে ওরা পারবেই বা কতদিনে? আমার অভিযান ত আর পনেরো দিনের ভিতরেই বেরুচ্ছে—"

"গেঁয়ো আদমি, বুঝতে পারিনি জাঁহাপনা। এখন মালুম হচ্ছে ভুল করেছি ওসব শেখাতে গিয়ে। কসুর মাফ হো যায়, এবার থেকে সাদা-মাঠা মারই শেখাব।"

"হ্যাঁ, তাই করবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—এসবে তুমি হাত এত রপ্ত রেখেছ কেমন করে? আমি যতদূর বুঝি, নিয়মিত অভ্যাস না করলে মারের আর ক্ষিপ্রতা থাকে না।"

গজরাজ এবার হেসে ফেলল—"আমি ত এতদিন নিত্যই মহারাজা বিজয়দেবের সঙ্গে খেলেছি জাঁহাপনা! তিনিও ওস্তাদ লোক, চার হাতিয়ারে সমান চলে তাঁর হাত—"

"তাই না কি? কিন্তু চার হাতিয়ারটা কী কী?"

"চার হাতিয়ার জাঁহাপনা, চার হাতিয়ার হল তরোয়াল, তীর ধনুক, গদা আর ভল্ল। সবেতেই পহেলা সারির ওস্তাদ হচ্ছেন জম্মু মহারাজা। বলতে কি, গদাযুদ্ধ আমিও তাঁর কাছেই তালিম নিয়েছি—"

"ওটার কোন দরকার হয় না আজকাল। তা সে কথা থাকুক, এখন যে ফৌজের সামনে মাঝে মাঝে প্যাঁচ কষতে দেখি, সেটা বোধহয় তোমার হাতকে রপ্ত রাখবার জন্যই? বিজয়দেব যখন আর খেলছেন না তোমার সঙ্গে—"

আবার ঈষৎ হেসে ফেলল গজরাজ—"জাঁহাপনার অনুমান ঠিক। কসুর মাফ হোয়। আর এরকম হবে না—"

আপনমনেই যেন ঘোরী বলতে লাগলেন এইবার—"গদা বাজে। তরোয়াল আর বল্লম আমিও মন্দ জানি না। তবে ঐ তীরন্দাজিটা? ওটার হাত খুব ভাল নয় আমার। এই অভিযানটা মিটে যাক, পাটনে গিয়ে বসব যখন, তোমার কাছে শিখব ওটা।"

"এমন নসিব কি বান্দার হবে?"—দুই হাতে সেলাম বাজাতে লাগল গজরাজ।

গুজরাটের রাজধানী পাটনে। তেমন বড় শহর নয়, চারধারে দিগন্ত ছোঁয়া মহাকান্তার। না পাহাড়, না নদী, প্রতিরক্ষার কোন ব্যবস্থাই প্রকৃতির দিক থেকে হয় নি। মানুষ? মানুষও সামান্যই করেছে। প্রাচীর আছে, পরিখাও আছে। তা সে প্রাচীর, একটা মানুষের কাঁধে আর একটা দাঁড়ায় যদি, অনায়াসে উঠে যাবে সে প্রাচীরের মাথায়। আর পরিখা ত শিশুরাই সাঁতরে পার হয় যখন তখন।

প্রতিরক্ষার সুবিধা নেই বলেই রাজা গজকেশরী হয়ত রাজধানী ছেড়ে চলে গিয়েছেন সব লোকজন নিয়ে।

পরিত্যক্ত নগরীতে যদৃচ্ছ ঘুরে বেড়ায় ঘোরীর সেনা। শিবির ফেলবার দরকার হয়নি। সব বাড়িই খালি। দশজন বিশজন করে এক এক

বাড়িতে ঠাঁই নিয়েছে সৈনিকেরা। এতে অবশ্য অসুবিধাও কিছু ঘটেছে। কাছাকাছিই সবাই আছে যদিও, একত্র আর নেই। কুচ-কাওয়াজের জন্য সৈন্যদের এক জায়গায় এনে জোটানো সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা।

তার উপরে, আর এক মুশকিল, বাসস্থান যদিও দরকারের চাইতেও দরাজ এখানে, খাদ্য কই? অবিবেচক গজকেশরী এক দানা শস্য রেখে যায়নি এই শহরে, পাঠানগুলোকে না খাইয়ে মারবারই যেন মতলব তার।

খাদ্য কোথায় পাওয়া যাবে? স্থানীয় লোক কেউ কোথাও নেই, কে দেবে খবর? মহম্মদ ঘোরী চর পাঠালেন চারিদিকে, মহাকান্তার পেরিয়ে অশ্বারোহীরা চলে গেল দশ বিশ ক্রোশ পর্যন্ত। আছে, ছোটখাটো কুঁড়ে আছে বই কি গরিব দুঃখীদের। তারা কেউ ভুঁই চষে, কেউ ছাগল চরায়, কেউ বা কাঠ কাটে বনে গিয়ে, মাথায় করে বেচতে নিয়ে যায় আরও পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরের হাটে। ওদের কাছে রসদ পাওয়ার আশা কিছু নেই।

দুই দিন এই ভাবেই কাটল। ফৌজের সাথে কিছু সঞ্চয় থাকেই খাবারের। তাই জঠর একেবারে শূন্য নয় সৈনিকদের। কিন্তু এভাবে এখানে পড়ে থাকার মানে হয় না ত! রাজ্য জয় করতে এসেছেন ঘোরী, জয় করবেন কাকে? শত্রু অদৃশ্য। ঘোরী বিরক্ত হয়ে তৃতীয় দিনেই আদেশ দিলেন—"পথে নামো আবার, দেখি খুঁজে কোথায় সে কাপুরুষ গজকেশরী।"

লুণ্ঠন? শূন্য পুরীতে কী আছে লুঠবার মত? ভারী ভারী আসবাবপত্র ছাড়া কিছুই আর নেই। তা সে সব বয়ে নিয়ে যাওয়া ত যায় না, নিয়ে গিয়ে হবেই বা কী? নগর চত্বরে একত্র করে আগুন লাগিয়ে দিলে দেখবার মত দৃশ্য একটা হয় বটে, কিন্তু টানাটানিতে মেহনতও ত কম নয়! বাড়িগুলো পাথরের, কাজেই সে সব জ্বালিয়ে দেওয়ার উপায় নেই।

চরেরা খবর নিয়ে এল—রাজধানী ছেড়ে সব নাগরিক আশ্রয় নিয়েছে দেশের অপর প্রান্তে, সমুদ্রের কাছাকাছি একটা জায়গায়। নাম তার জয় সমুন্দর না ঐরকমই অন্য কিছু একটা। শহর নয়, একদিকে সমুদ্র, দুইদিকে দুটো নদী, চতুর্থ অর্থাৎ পুব দিকটাতে বড় বড় পরিখা কাটছে তারা। এখনও কেটে শেষ করতে পারেনি। শেষ হয়ে গেলে সে স্থান অগম্য হবে শত্রুর। অতএব—

অতএব, শেষ হওয়ার আগেই সেইখানে গিয়ে আক্রমণ করতে হবে তাদের। কত রাস্তা? দ্রুতগামী অশ্বারোহীর পক্ষেও তিনদিনের রাস্তা। হোক তাই, গজনী থেকে যারা পাটনে আসতে পেরেছে, তাদের পক্ষে তিনদিনের দূরত্ব বেশী কী আর?

সৈন্য সেজে বেরুল। যাত্রার আগে জমায়েতটা ঠিক ঠিক মিলিয়ে নেওয়ার ভার বক্সীর উপরে। বক্সী রসুল খাঁ এসে এত্তেলা করল—"সেই হিন্দু ওস্তাদটাকে পাওয়া যাচ্ছে না জাঁহাপনা! অস্ত্র-শিক্ষক গজরাজকে।"

"পাওয়া যাচ্ছে না? কবে থেকে পাওয়া যাচ্ছে না?"

"কালও নগর চত্বরে সে নতুন সিপাহীদের বল্লম ছোঁড়া শিখিয়েছিল। তখন বেলা দেড় প্রহর আন্দাজ হয়েছে। তারপর তার খোঁজ রাখার প্রয়োজন কারও হয়নি। কোথায় সে গেল, কী তার হল, কেউ জানে না।"

মহম্মদ ঘোরী বিরক্ত হয়ে দাড়ি ধরে টানতে লাগলেন জোরে জোরে। এ তাঁর একটা মুদ্রা দোষ। বক্সী রসুল ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল—"তাকে বাদ রেখেই পলটন যাত্রা করে যদি, লোকসান কী

তাতে? সে হল বিধর্মী, বেইমান হওয়ারও আটক নেই। এখন জাঁহাপনার যা হুকুম হয়—"

"যাত্রা কর। তা ছাড়া আর উপায় কী? তবে বেইমান বলে আমার মনে হয় না, সম্ভবতঃ সে কোন বিপদে পড়েছে—" বলেই ঘোরী এক চক্কর ঘুরে এলেন ঘরের ভিতর—"কে বিপদে পড়ল না পড়ল দেখবার সময় কোথায় আমার? চলো, জয় সমুন্দর—"

আবার সেজে বেরুল বাহিনী, মহাকান্তারের ভিতর এগিয়ে চলল সারা দিন। আগে আগে এক পলটন অশ্বারোহী, তারপরে পদাতিক—ঢালী শূলী, কুঢ়ালী। ঢালীরা লড়ে ঢাল তরোয়াল নিয়ে, শূলীরা বল্লম নিয়ে, কুঢ়ালীরা রণকুঠার নিয়ে। একুনে প্রায় ষাট হাজার পদাতিক সৈনিক। এদের পরে উট, এইসব উটের পিঠেই রসদ, জলের জালা, ছাউনির তাঁবু।

উটের পরেও আবার আর একদল অশ্বারোহী, ঘোরীর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে। অন্ততঃ পাঁচ হাজার এদের সংখ্যা। এদের বাহনগুলিই কতকটা ঘোড়ার মত দেখতে। বাহিনীর পুরোভাগে যে ঘোড়ারা ছুটছে, তারা পাহাড়িয়া টাট্টু মাত্র। মেহনতী জানোয়ার সন্দেহ নেই, কিন্তু দর্শনধারী মোটেই নয়। কাবুল দরিদ্র দেশ, সুলতান মামুদ সতেরো-বার হিন্দুস্থান লুঠ করে যে পর্বতপ্রমাণ সোনা নিজের মুলুকে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর বংশের পরবর্তী সুলতানেরা তা ব্যয় করে নিঃশেষ করে গিয়েছেন, ঘোরীরা তার কানাকড়িও পাননি উত্তরাধিকার সূত্রে। ভাল ঘোড়া আরব থেকে কিনবার অর্থ কই তাঁদের।

যাহোক, সন্ধ্যা হয়ে এল, মহাকান্তারের সর্বত্রই একরকম জমিন, ঊষর কাঁকর ভরা মাটি, মাঝে মাঝে বেঁটে বেঁটে খেজুরের ঝোপ বা বাবলার সারি। ছাউনির জন্য জায়গা বাছাবাছির সার্থকতা কিছু নেই। মীর বক্সী এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে ভেরী বাজিয়ে দিলেন। তার মানে এইখানেই তাঁবু ফেলতে হবে। রাত্রির মত এইখানেই বিশ্রাম।

একটানা ঘুম ঘোরীর বরাতে কোনদিনই নেই, কারণ সৈন্যাধ্যক্ষদের উপরে আস্থা নেই তাঁর। রাত্রির প্রহরীরা জেগে আছে কিনা, সতর্ক আছে কিনা, প্রতি রাত্রে অন্ততঃ তিনবার তিনি নিজে তার তদারক করেন। তার কোন ধরাবাঁধা সময় নেই। ঘোর দুর্যোগের রাতেও তার কামাই নেই। নিজেরই তাঁবুর বাহির দিকে কয়েকজন রক্ষী থাকে তাঁর। তাদের সঙ্গে নিয়ে অন্ধকারেই তিনি ছুটে বেরোন। কোন প্রহরীকে নিদ্রিত দেখতে পেলে তাকে আর জেগে উঠবার অবকাশ দেন না। সে নিদ্রাকে সঙ্গে সঙ্গে চিরনিদ্রায় পরিণত করে দেন নিজেরই তরোয়ালের একটি আঘাতে।

সে রাতেও তিনি বেরিয়েছেন, ঘুরতে ঘুরতে চলে গিয়েছেন শিবিরের শেষ সীমানায়। প্রহরীদের শেষ সারি এখানে। সেই সারির মাঝে মাঝে শুকনো খেজুর পাতা গাদা করে করে আগুন জ্বালানো হয়েছিল রোটি পাকাবার জন্য। সে-আগুন এখনও ধিকি ধিকি জ্বলছে এক এক জায়গায়। এই রকম একটা নিবন্ত আগুনের ওপাশে যেন একটা কালো ছায়া দেখতে পেলেন ঘোরী। তাঁর সঙ্গী মনসবদার আলিউল্লা সঙ্গে সঙ্গে হেঁকে উঠল—"কৌন্ হ্যায়?"

"বান্দা গজরাজ প্রমার"—

"গ-জ-রাজ? একা?"—প্রশ্ন করলেন ঘোরী।

"জাঁহাপনা, একা"—

"দুই হাত উপরে তুলে এগিয়ে এস আগুনের পাশে"—

একজন সৈনিক আগুনটা উস্‌কে দিয়ে একটুখানি আলো বার করল তা থেকে। গজরাজ এগিয়ে এল দুই হাত উপরে তুলে। আসামাত্র আলিউল্লা তার দেহ তল্লাশী করল সযত্নে। কটি-লগ্ন তরবারি ছাড়া অস্ত্র আর কিছুই পেল না আলিউল্লা, কিন্তু—

পেল তার বক্ষোবসনের ভিতর একটা থলে। সেটা উবুড় করতেই একরাশ কী যেন ঠুংঠাং শব্দ করে মাটিতে পড়ে গেল, আর আলোর ঝলক পেয়েই ঝকমক করে উঠল, দুপুরের রোদের মত।

গজরাজ নিজেই বলল—"হীরে জাঁহাপনা"—

"হী-রে? এ-ত? কোথায় পেলে?"

"পাটনের সেই বাড়িতে, যেখানে আমার ডেরা নির্দিষ্ট হয়েছিল। ঘরের ভিতর আমার পায়ের নীচেই একখানা পাথর হঠাৎ বেমালুম সরে গেল, আমি হুড়মুড় করে পড়ে গেলাম নীচে। সেখানেও একটা ঘর, তার দরোজাটরোজা নেই! সেই ঘরেই একটা মস্ত সিন্দুক, তার ভিতর এই রকম হীরে ঠাসা ভরতি। কয়েকখানা মাত্র এনেছি জাঁহাপনাকে দেখাবার জন্য।"

"কিন্তু দরোজা নেই, তুমি বেরুলে কী করে সে ঘর থেকে? সাহায্য করার লোক ত পাটনে ছিল না নিশ্চয়ই?"

"না, তা ছিল না। সিন্দুক থেকে সব হীরে মেজেতে নামিয়ে রাখলাম, তারপর দেহে আমার শক্তি কম নয়, জানেন ত জাঁহাপনা। সেই সিন্দুকটাকেই খাড়া করে তুললাম, মাথার উপরকার গুপ্তদ্বারের নীচে। হাত বাড়িয়ে নাগাল পেলাম ছাদের। লোহার শরীর বলেই সে ফাঁক দিয়ে বেরুতে পেরেছি, এই দুখানি হাতমাত্র সম্বল করে।"

এক সিন্দুক হীরে? মহম্মদ ঘোরী তৎক্ষণাৎ ঘোড়ায় উঠলেন একশো অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়ে।

গজরাজ এগিয়ে এল দুই হাত উপরে তুলে।

সমস্ত বাহিনী ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার মানে হয় না কিছু। ঘোরী যাবেন, আর হীরে নিয়ে কাল সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে আসবেন। সিপাহসালার জাহান-পনি মীর্জার উপর বাহিনীর ভার দিয়ে ঘোরী বেরিয়ে পড়লেন গজরাজকে নিয়ে।

গজরাজ মিথ্যা বলেনি। পাটনের ভাঙা বাড়িতে মেজে ভাঙা। আলিউল্লাই প্রথমে নামল এবং নেমেই চেঁচিয়ে উঠল—"জাঁহাপনা, সব ঠিক আছে, মেজেতে এক হাঁটু পুরু হয়ে হীরে ছড়িয়ে আছে।"

নামলেন মহম্মদ ঘোরী, নামল সৈনিকেরা কয়েকজন হুড়মুড় করে, আর শেষ সৈনিকটা নামবার সঙ্গে সঙ্গে উপরের গুপ্তদ্বারের পাথরখানা সরে এসে নিজস্থানে এঁটে বসল। গজরাজ যে নামেনি, এটা তাড়াতাড়ি খেয়াল হয়নি কারও।

একশো সৈনিকের মধ্যে যারা বাড়ি ঘিরে ছিল, তারা আক্রান্ত হল বৃহৎ একদল গুজরাটি সেনার দ্বারা।

সেই রাত্রেই মহাকান্তারেও ঘোরীর সেনাকেও বেষ্টন করে ফেলল গুর্জরবাহিনী। ঘোরীর অনুপস্থিতি, তাঁর সৈন্যাপত্যের অভাব, পাঠান সেনার পক্ষে হয়ে দাঁড়াল মারাত্মক। সিপাহ-সালার জাহান-পনি নিহত হলেন যুদ্ধে, নিহত হল অন্ততঃ দশ হাজার সৈনিক।

বন্দী মহম্মদ ঘোরী যখন পাটনরাজ সভায় আনীত হলেন, তখন তিনি বিস্ময়ে হতবাক্। সিংহাসনে বসে আছেন যিনি রাজবেশে, তিনি সেই গজরাজ, তাঁর বেতনভুক অস্ত্রশিক্ষক।

"জনাব ঘোরী! পরস্বাপহারী হানাদারকে কঠোর দণ্ডেই দণ্ডিত করা উচিত। কিন্তু আমার বিবেচনায় দণ্ড আপনার কম হয়নি, দশ হাজার সৈনিক আপনার নিহত হয়েছে যুদ্ধে। আপনাকে আমি মুক্তি দেব, তবে এক মাস পাটন-কারাগারে বন্দী থাকার পরে। আপনার আরাম-বিরামের যথাসম্ভব ব্যবস্থা অবশ্য হবে সেখানে।

আশা করি আর কখনও ভারতে প্রবেশ করবেন না এদেশের শান্তি ভঙ্গ করবার জন্য।"

মহম্মদ ঘোরীর পরবর্তী ইতিহাস জানেন সবাই! রাজা গজকেশরীর আশা পূর্ণ হয়নি। মুক্তি যদি তিনি না দিতেন ঘোরীকে, ভারতের ইতিহাস হত অন্যরকম। ভারতীয়দের উদারতাই যুগে যুগে সর্বনাশ ঘটিয়েছে ভারতের।

গুগলিয়েমো মার্কনি

বড় বিজ্ঞানীরা সাধারণতঃ একই সঙ্গে একাধিক বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে যেতে ভালবাসেন। ইতালির মার্কনি কিন্তু এদিক দিয়ে ব্যতিক্রম। সারাজীবন তিনি রেডিও টেলিগ্রাফ নিয়েই মেতে ছিলেন। অয়ারলেস টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লাভ করেন নোবেল প্রাইজ।

ইতালির বোলোনা নগরে তাঁর জন্ম ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। পিতা ইতালীয়, মাতা আইরিশ। বিদ্যারম্ভ হয় গৃহশিক্ষকদের কাছে, পরে ইনি ভর্তি হন লেগহর্ণ টেকনিকাল স্কুলে, এবং সেখানে অধ্যয়ন করেন পদার্থবিদ্যা। বিশেষতঃ এর বৈদ্যুতিক-চৌম্বক তরঙ্গসম্পর্কিত অংশ।

টেলিগ্রাফ নিয়ে তখন সারা পৃথিবীতে প্রখর উত্তেজনা। মার্কনির মাথায় এল—তিনি বেতার টেলিগ্রাফের উদ্ভাবন করবেন। স্বভাবতঃই ইতালীয় সরকারের সহযোগিতা প্রার্থনা করলেন তিনি এ-ব্যাপারে, কিন্তু তাঁদের কাছে উৎসাহ না পেয়ে চলে গেলেন ইংলণ্ডে। সেখানে ডাকবিভাগের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার উইলিয়াম প্রীস-এর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে সলস্‌বেরি প্রান্তরে পরীক্ষা চালাতে শুরু করলেন বেতার টেলিগ্রাফের। পরীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হল। বেতার এবং রেডিওবার্তার উদ্ভাবন হল ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর।

অশেষ সম্মানে সম্মানিত হয়ে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন মার্কনি।

———

● বিদেশী গল্প

বীরতীর্থ

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

আকোর কিল্লাদার আজ ক্রুদ্ধ।

সাধারণতঃ ক্রোধনস্বভাবের লোক ইনি নন। এই কিল্লাদার আসানো টাকুমি নো-কামি। একটা সামুরাই* বীরপুরুষের পক্ষে যতখানি হীনতা স্বীকার করা সম্ভব, তা তিনি করেছেন। করেছেন শুধু সম্রাটের মুখ চেয়ে। জাপানী বীরের চোখে মিকাডো* সম্রাট ত সাক্ষাৎ দেবতা!

ঘটনা এই—মিকাডোর দরবার থেকে শীঘ্রই একজন রাজপ্রতিনিধি আসছেন এই অঞ্চলে, স্থানীয় ভূস্বামীদের কাছে সম্রাটের আশীর্বাণী পৌঁছে দেবার জন্য। যেমন-তেমন প্রতিনিধি নন, নিজেও ইনি সম্রাটবংশীয় বিখ্যাত পুরুষ একজন। এঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য সেণ্ডাইয়ের রাজার নেতৃত্বে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়েছে একটি। আঞ্চলিক অভিজাতেরা হয়েছেন সে-সমিতির সভ্য।

এই সভ্যদের কাজ হবে রাজপ্রতিনিধির ধারে কাছে সব সময় উপস্থিত থাকা, তাঁর সুখ-সুবিধার দিকে সারাক্ষণ নজর রাখা।

এই নজর-রাখা ব্যাপারটি সহজ নয়। সম্রাটবংশীয় ব্যক্তিমাত্রই ত, পুরো না হলেও আধাআধি দেবতা। তাঁদের সঙ্গে সাধারণ লোককে যদি কথাবার্তা কইতে হয়, ওঠাবসা করতে হয়, তবে যেমন-তেমন ভাবে তা করা চলবে না। বহু-বহু যুগ আগে এ-ধরনের উচ্চ-নীচ মেলামেশাকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল। আজও দেশের লোক অক্ষুণ্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলে সে সব।

অর্থাৎ মেনে চলে, উপলক্ষ ঘটলে। কদাচিৎই ঘটে তেমন উপলক্ষ। এই ত এ-অঞ্চলে সম্রাট-বংশীয় কোন অর্ধদেবতার আগমন এবার ঘটছে প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে। আজ সেণ্ডাইয়ের রাজা ত এমন লোক একটাও খুঁজে পাচ্ছে না, যে না কি যুগ যুগ আগে বিধিবদ্ধ সেই বিধিনিষেধ-গুলির বিন্দুবিসর্গেরও খবর রাখে।

নিরুপায় হয়ে সেণ্ডাই রাজা সম্রাট দরবারেই মিনতি জানালেন—বিশেষজ্ঞ কোন রাজপুরুষকে অবিলম্বে এখানে পাঠানো হোক, স্থানীয় অপোগণ্ড অভিজাতবর্গকে শিখিয়ে পড়িয়ে ওয়াকিবহাল করে তুলবার জন্য। তা নইলে কেতাদুরস্ত আদব-কায়দার দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে রাজপ্রতিনিধির আদর-আপ্যায়নের ব্যাপারে।

সম্রাট দরবার এরকম গুরুতর পরিস্থিতিতে উদাসীন থাকতে পারেন না। তাঁরা বেছে বেছে একজন আদবকায়দাবিশারদকে সেণ্ডাইয়ে পাঠালেন, নাম তাঁর কোৎসুকে নো-সুকে। মহামান্য এই রাজপুরুষটিও আগ্রহ করেই এলেন এখানে, কারণ তাঁর শ্বশুরালয় সেণ্ডাইয়েই।

কোৎসুকে নো-সুকে এখানে এসে রীতিমত পাঠশাল খুলে দিলেন সব সামুরাই যোদ্ধাকে নিয়ে। এইভাবে হাঁটতে হবে, ওভাবে বসা চলবে না রাজপ্রতিনিধির সামনে। তাঁর সঙ্গে কথা কইবার সময়ে মাথা ঠিক এতখানি নোয়াতে হবে, তাঁর সমুখে হাসা প্রয়োজন হয়ে উঠলে ঠিক নয়টা দাঁত তাঁকে দেখাতে হবে, দশটাও না, আটটাও না। এই সব জটিল বিষয় নিয়ে নিয়মিত আলোচনা এবং অনুশীলন। তাঁর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ সামুরাইদের উপরে যে-ভাষায় তিনি শাসন চালাতে লাগলেন,

---

* সামুরাই—প্রাচীন জাপানের ক্ষত্রধর্মাবলম্বী যোদ্ধ-সম্প্রদায়।

* মিকাডো—জাপানের সম্রাট।

তা একমাত্র শিশুদের পাঠশালাতেই শোনা গিয়ে থাকে গুরুমশাইয়ের মুখে। ধমক-ধামক তিরস্কার দিনের দিন কঠোর থেকে কঠোরতর হতে লাগল। সামুরাই বীরেরা অতিষ্ঠ অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন।

প্রতিকার? প্রতিকার কী এ অবস্থায়?

সব ব্যাধিরই ওষুধ আছে। অধিকাংশ পড়ুয়া দায়ে পড়ে ওষুধ প্রয়োগ করতে লাগলেন—উৎকোচ। দাও ত, ঘুষ দাও লোকটাকে! অর্থের বশীভূত হয় না, এমন লোক দুনিয়ায় দুর্লভ। দেখ, ঘুষ পেলে ভদ্র ব্যবহার করে কি না ও!

অবাক্ কাণ্ড! এ-ওষুধ যেন ধন্বন্তরির ওষুধ! রাতারাতি ব্যবহার পালটে গেল নো-সুকের। যারা ঘুষ দিয়েছে, তারা দেখল, এক নতুন নো-সুকের সঙ্গে কথা কইছে তারা। এমন হাসিখুশী, বিনয়ী, অমায়িক লোক গোটা সেণ্ডাইতে কেউ এযাবৎ দেখেনি। শিক্ষার্থী সামুরাইদের সঙ্গে কথা কইছেন নো-সুকে, সে-কথায় মধুবৃষ্টি হচ্ছে যেন। বন্ধুর মত অন্তরঙ্গ, ভাইয়ের মত স্নেহশীল। অবাক্ কাণ্ড!

হ্যাঁ, অন্তরঙ্গ এবং স্নেহশীল। যারপরনাই। কিন্তু ব্যতিক্রমও যে নেই, তা নয়। এক হতভাগ্য সামুরাই চিহ্নিত হয়ে রয়েছেন কৃষ্ণ মেষ হিসাবে। কোৎসুকে নো-সুকের ব্যবহার আদৌ পালটায়নি এই ভদ্রলোকের সম্পর্কে, বরং দিন দিন যেন বর্বরোচিত হয়ে উঠছে। এর কারণও অজানা নেই কারও। উৎকোচ ইনি দেননি, এক আউন্স রূপোও না। যেখানে কামেই সামা এবং আরও অনেকে হাজার আউন্স করে উপহার দিয়েছেন দণ্ডদর গুরুমশাইকে।

এই ব্যতিক্রমটিই হচ্ছেন টাকুমি নো-কামি। যাঁর কথা দিয়ে কাহিনী আরম্ভ হয়েছে।

নীতিনিষ্ঠ লোক এই টাকুমি নো-কামি। উৎকোচ তিনি জীবনে কাউকে দেননি, দেবেনও না জীবন থাকতে। নো-সুকের ইতরতা থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায় তাঁর সহকর্মীরা দেখতে পাননি। কিন্তু টাকুমি তা পেয়েছেন। প্রথম দিনই নো-সুকের আচরণে সে-উপায়ের কথা মাথায় এসেছিল তাঁর। যত দিন যাচ্ছে, মাথার উপর অপমানের বোঝা যত ভারী হচ্ছে, ততই সেই প্রথম দিনের অস্পষ্ট পরিকল্পনা দানা বাঁধছে তাঁর মনে। সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন তিনি দেখছেন না। ওরা ত ঘুষ দিয়ে রেহাই পেয়েছে লাঞ্ছনা থেকে। না, পরামর্শ চাইলে ঐ একটি ছাড়া অন্য পরামর্শ তিনি পাবেন না কারও কাছ থেকে। তা হল এই যে "তুমিও হাজার আউন্স রূপো এনে পুরে দাও নো-সুকের পকেটে, দেখতে দেখতে দুনিয়া উজ্জ্বল হয়ে উঠবে তোমার সমুখে।"

সে-পরামর্শ কখনোই নিতে পারবে না টাকুমি। অতএব—

যে-পরিকল্পনা দানা বাঁধতে বাঁধতে স্থির সংকল্পে পরিণত হয়েছে ক্রমশঃ, তাকেই কার্যে পরিণত করতে হবে। টাকুমি নো-কামি প্রস্তুত হলেন। এ-কাজের পরিণাম যে ভয়াবহ হতে বাধ্য, তাতে তিলমাত্র সন্দেহ নেই টাকুমির। তবু, সামুরাই ভূস্বামীর অপমান করে নিস্তার কেউ পায়নি কোনদিন, আজও পাবে না। সম্রাটের নামের আশ্রয় নিয়েও না।

সেদিন সকাল বেলাতেই কোৎসুকে নো-সুকের সমুখে ডাক পড়েছে অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যদের। সবাই তাঁরা সোৎসাহে সমবেত। কারণ নো-সুকে এখন ত তাঁদের বন্ধুস্থানীয়! পরম সমাদরেই গ্রহণ করবেন পড়ুয়াদের! জনে জনে হাসিমুখে ঘিরে ধরেছেন গুরুকে। গুরুরও মুখ বসন্ত প্রভাতের মত নির্মল সমুজ্জ্বল।

কিন্তু সেই প্রসন্ন মুখকান্তি অচিরেই মেঘাচ্ছন্ন

হয়ে গেল, টাকুমি নো-কামির দিকে চোখ পড়তেই। এ লোকটা এখনও রূপোর থলে সেলামী দেবার নাম করছে না? আজ ওকে এমন শিক্ষা দেবেন নো-সুকে—

"রাজপ্রতিনিধি যখন আসবেন"—বক্তৃতা শুরু করলেন নো-সুকে—"যখন তিনি এসে দাঁড়াবেন আপনাদের সমুখে, মনে করুন আপনারা, দৈবাৎ রাজ-প্রতিনিধির জুতোর ফিতেটি খুলে গেল। তখন আপনাদের কর্তব্য হবে হেঁট হয়ে বসে সেই ফিতে বেঁধে দেওয়া। ঠিক কী ভাবে বসতে হবে, কী কায়দায় বাঁধতে হবে সেইটিই আজ আমি শেখাব আপনাদের—"

টাকুমি ক'টি থেকে ঝনাৎ করে খুলে নিলেন তরোয়াল।

বলতে বলতে নো-সুকে নিজের জুতোর ফিতে নিজেই খুলে ফেললেন এবং মাটিতে পা নামিয়ে ডেকে বললেন—"বন্ধুবর টাকুমি নো-কামি, আপনি এসে এই ফিতেটা বাঁধুন দেখি! দরকারী কায়দাটা শিখে রাখুন, কাজে লাগবে একদিন।"

পা বাড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কোৎসুকে নো-সুকে, মুখে কুটিল হাসি। আদেশ পালন করতেই হবে টাকুমিকে। কারণ নো-সুকে হচ্ছেন সম্রাটপ্রেরিত শিক্ষক। কিন্তু আদেশ পালনের অর্থ এক্ষেত্রে দাঁড়াবে—

দাঁড়াবে যে আকোর কিল্লাদার জুতোর ফিতে বেঁধে দিয়েছেন কোৎসুকে নো-সুকের। তারপরে অভিজাত সমাজে আর কি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেন টাকুমি?

টাকুজির বন্ধুরা তির্যকনেত্রে তাকিয়ে আছেন টাকুমির দুর্দশা উপভোগ করবার জন্য। চিরকালের মত একটা হাসির গল্প তৈরি হতে যাচ্ছে। দেখে রাখা দরকার।

টাকুমি এগিয়ে এলেন। একেবারে মুখোমুখি দাঁড়ালেন নো-সুকের। তারপর হঠাৎই ক'টি থেকে ঝনাৎ করে খুলে নিলেন তরোয়াল।

স্বভাবতঃই নো-সুকে চমকে উঠে পিছিয়ে গেলেন এক পা। তাঁর চোখে ফুটে উঠল বিস্ময় আর আতঙ্ক।

টাকুমি বলছেন—"মহান রাজপুরুষ কোৎসুকে নো-সুকে! আপনি আমার অপমান করেছেন আপনার জুতোর ফিতে বাঁধবার হুকুম জারি করে। রাজপ্রতিনিধির প্রতি সম্যক্ সম্মান দেখাতে আমরা বাধ্য থাকব নিশ্চয়ই, কিন্তু তার মানে এ নয় যে, আমরা নিজেদের নামিয়ে নিয়ে যাব ক্রীতদাসের পর্যায়ে। আপনি আমার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করে আসছেন গোড়া থেকেই, আজ একেবারে উঠে গিয়েছেন অভদ্রতার চরমে। কিল্লাদার সামুরাইকে বলেছেন ক্রীতদাসের কাজ করতে। অতএব, এ-পাপের যা প্রায়শ্চিত্ত, তা আপনাকে করতে হবে। রক্ত দিতে হবে কোৎসুকে নো-সুকে! আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি আপনাকে।"

কোন সামুরাই কখনও যা করেনি, কোৎসুকে

নো-সুকে তাই করল। দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান পাওয়ার পরে, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল প্রাণভয়ে। সে ছুটে পালায় দেখে টাকুমি ত্বরিত হস্তে অস্ত্রাঘাত করলেন একবার। মুখখানা তখনো পুরোপুরি ফেরাতে পারেনি ভীরু। গালের উপর লম্বা দাগ কেটে দিয়ে গেল টাকুমির তরবারি।

তারপর নো-সুকে পালাচ্ছে চিৎকার করতে করতে, মুক্ত অসিকরে তার পিছনে ছুটেছেন টাকুমি। অন্য সমুরাইরা হতভম্ব এই অভাবনীয় কাণ্ড দেখে। নিরপেক্ষ দর্শক ছাড়া অন্য কোন কিছুর ভূমিকা নিতে নারাজ তাঁরা।

নো-সুকের চিৎকারে তার পার্শ্বচরেরা ছুটে এল অনেকে। এদিকে টাকুমি ত একা সেই শত্রুপুরীতে। তাছাড়া, নো-সুকে ছাড়া আর কারও দেহে আঘাত করতে তিনি ইচ্ছুকও নন। দাঙ্গা করতে তিনি আসেননি, এসেছিলেন দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে। নো-সুকের লোকেরা তাঁকে বন্দী করল।

দ্বন্দ্বযুদ্ধের কোন সাজা নেই। কিন্তু দ্বন্দ্বযুদ্ধ ত এখানে হতে পারে নি। ঘটনাটার চেহারা দাঁড়িয়েছে এইরকম যে, কর্তব্যরত সম্রাট-কর্মচারীর উপরে একতরফা আক্রমণ হয়েছে একটা, বিলক্ষণ রক্তপাতও হয়েছে তাতে। মিকাডোর আদেশ এল কয়েকদিন পরে—টাকুমি নো-কামিকে হারাকিরি * করতে হবে।

করলেন টাকুমি হারাকিরি।

সম্রাটের আদেশে আকো দুর্গ অন্য এক বংশের হাতে সঁপে দেওয়া হল। টাকুমির নিজস্ব সৈনিক ছিল যে সাতচল্লিশ জন, তারা রোনিন অর্থাৎ প্রভুহীন হয়ে কেউ খুলে বসল দোকান, কেউ-বা চাকরির উমেদারি করতে লেগে গেল অন্য সামুরাইদের কাছে।

* হারাকিরি—নিজের হাতে উদর বিদীর্ণ করে আত্মহত্যা করা।

এটা কিন্তু তাদের ভান মাত্র। জনে জনে তারা প্রাণ দিয়ে ভালবাসত টাকুমি নো-কামিকে। তাঁর এই অন্যায় এবং অপঘাত মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য জনে জনে তারা কৃতসংকল্প হয়েছে। টাকুমির জীবদ্দশায় এই সৈনিকদের নায়ক ছিলেন জনৈক অয়শি কারান্‌সুকে। এই প্রতিহিংসার প্রয়াসে তাঁকেই সৈনিকেরা নির্বাচিত করল নেতা রূপে। যেমন সাহসী, তেমনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই অয়শি। তাঁরই নির্দেশে ছেচল্লিশটা রোনিন বাহ্যতঃ এমনি ভাব দেখাতে থাকল, যেন প্রতিহিংসার কোন চিন্তাই তাদের মগজে নেই। সারাদিন কর্মান্তরে ব্যাপৃত থাকে তারা, গভীর রাত্রে এক একদিন এক এক জায়গায় মিলিত হয় শলা-পরামর্শের জন্য।

অতি সঙ্গোপনে এগুতে হবে তাদের। কারণ তাদের এই প্রতিহিংসার উদ্যম সম্বন্ধে কোন কথা যদি ঘুণাক্ষরে প্রকাশ হয়ে পড়ে, কোৎসুকে নো-সুকে তক্ষুণি পালিয়ে যাবে টোকিওতে, আশ্রয় নেবে স্বয়ং মিকাডোর। সেখানে গিয়ে ওর উপর আক্রমণ চালানো প্রায় অসম্ভবই হয়ে দাঁড়াবে।

এমনিতেই ভয়ের বা সন্দেহের কোন কারণ কোথাও দেখতে না পেলেও নো-সুকে লোকটা সর্বদাই সতর্ক রয়েছে। তার শ্বশুর ইউসেগী সামা একজন পরাক্রান্ত ব্যক্তি। ইয়েজে শহরে তাঁরই একটা সুরক্ষিত বাড়িতে নো-সুকে বাস করে এখন। সেখানে ইউসেগীর একদল সৈনিক প্রতিনিয়ত পাহারা দেয় তাকে। অয়শি কোরান্‌সুকে তাঁর ছেচল্লিশ জন সাথীকে নিয়ে অতর্কিতে আক্রমণ চালালেও যে খুব সহজে নো-সুকের মুণ্ডটা কেটে আনতে পারবেন, এমন আশা করার কারণ নেই কিছু।

তবু কোরান্‌সুকেরা আছেন ধৈর্য ধরে। আছেন সুযোগের প্রতীক্ষায়। অবশেষে এল সে

সুযোগ। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। আশা এবং আশঙ্কা দুটোই সমান প্রবল।

এল সুযোগ। দুর্জয় শীতের দিন। সন্ধ্যার আগেই সব মানুষ ঘরে ঢুকে অগ্নিকুণ্ডের কোণটিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। বরফে বরফে সাদা-সাদা সারা পৃথিবী। ইয়েডো শহরে ইউসেগী সামার বাড়ির সমুখে পিছনে দুই দল লোক এসে জমায়েত হল গভীর নিশীথে। সমুখের দরোজায় তেইশ জন রোনিন নিয়ে উপস্থিত নিজে অয়শি কোরান্‌সুকে। পিছনের দরোজায় বাকী বাইশজন নিয়ে তাঁর ষোলো বছরের পুত্র অয়শি শিকারা।

ইতিপূর্বে ধারে-কাছের সব বাড়িতে এদেরই একজন লোক গিয়ে বলে এসেছেন—"আমরা, স্বর্গীয় টাকুমি নো-কামির সৈনিকেরা আজ রাত্রে প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছি তাঁর অন্যায় হত্যার। ইউসেগী সামার বাড়ি থেকে কোলাহল শুনতে পেলে আপনারা দয়া করে সেদিকে যাবেন না কেউ। এ-ব্যাপারে যাঁরা সংশ্লিষ্ট নন, তাঁদের দেহে দৈবাৎ কোন আঘাত লেগে গেলে আমাদের মনস্তাপের অবধি থাকবে না।"

কোৎসুকে নো-সুকে এই সব প্রতিবেশীর কেউ নয়, পরন্তু পরলোকগত টাকুমির উপরে সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা ছিল যথেষ্ট। কাজেই সবাই স্বীকার করল কোৎসুকে নো-সুকের সাহায্যে কেউই তারা অগ্রসর হবে না।

কোরান্‌সুকের আদেশে দরোজা ভেঙে ফেলল সৈনিকেরা। সে-আওয়াজে অবশ্যই নিদ্রাভঙ্গ হওয়া উচিত ছিল ভিতরের লোকদের। কিন্তু শীতের রাত্রি, কম্বল মুড়ি দিয়ে যারা ঘুমোচ্ছে, অল্প-স্বল্প গোলমালে কি ঘুম ভাঙে তাদের?

ঘুম অবশ্য ভাঙল শেষ পর্যন্ত। না ভেঙে উপায় নেই, কারণ কম্বল ফুটো করে তরোয়ালের খোঁচা লাগছে গায়ে। নো-সুকের রক্ষীগুলোকে

"নিজের অপরাধের শাস্তি নিজেই গ্রহণ করুন।" [পৃষ্ঠা ১৭৮

ঘুমন্ত অবস্থায় কেটে ফেলে দেবে, এমন কাপুরুষ আক্রমণকারী রেনিনেরা নয়। আগে জাগিয়ে তুলে তারপরে সম্মুখ যুদ্ধে তাদের নিহত করাই উদ্দেশ্য তাদের।

তাছাড়া লোকগুলোকে জাগিয়ে না তুললে কেমন করে বোঝা যাবে যে কোৎসুকে নো-সুকে নিজেও তার সৈনিকদের সঙ্গে মিশে একসাথে শুয়ে আছে কিনা প্রাণভয়ে? টাকুমির দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান পাওয়ার পরে নির্লজ্জের মত যে ভীরু মুক্ত কচ্ছ হয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিল, তার পক্ষে যে-কোন হীনতা স্বীকার করাই সম্ভব।

নো-সুকের সুপ্তোত্থিত সৈনিকের অবস্থাটা উপলব্ধি করল যখন, আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করল অবশ্য। প্রাণপণেই যুদ্ধ করল। কিন্তু টাকুমির রোনিনেরা আজ প্রতিহিংসায় উন্মত্ত, বর্ষকালের পুঞ্জীভূত রোষ আজ অগ্নিশিখার মত লেলিহান হয়ে উঠেছে শত্রুকে পুড়িয়ে মারবার জন্য। তাদের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধে নো-সুকের বেতনভুক

অনুচরেরা পেরে উঠবে কেন? তারা কতক হতাহত হল, কতক বা পাঁচিল টপকে রাস্তায় গিয়ে পড়ল প্রাণ বাঁচাবার জন্য।

যুদ্ধ থামল, কিন্তু নো-সুকের দেখা পাওয়া গেল না। এতই সে কাপুরুষ যে যুদ্ধের ভার সৈনিকদের উপর দিয়ে সে গোড়া থেকেই আত্ম-গোপন করে রয়েছে নিজের স্ত্রী-পরিজন সঙ্গে নিয়ে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর রোনিনেরা আবিষ্কার করল যে আস্তাবলের ভিতর খড়ের মাচায় কয়েকজন লোক গাদাগাদি করে বসে আছে। তাদের টেনে নামানোর পরে দেখা গেল, পুরুষ সে দলে একজনই মাত্র আছে।

আছে একজন পুরুষ, কিন্তু সেই যে পামর কোৎসুকে নো-সুকে, তার প্রমাণ কী? কোন জিজ্ঞাসাবাদেই লোকটা উত্তর দেয় না। ঘাড় গুঁজে বসে আছে, মুখটি বুজে। এই যে সেই নো-সুকে, এটা নিশ্চিত বুঝতে না পারলে একে হত্যা করা যায় কেমন করে? যুদ্ধে হত্যা করা এক কথা, আর যুদ্ধে পরাঙ্মুখ ভয়ার্তকে হত্যা করা আর এক কথা।

হঠাৎ কোরান্‌সুকের মনে পড়ে গেল একটা কথা। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—"ওর মুখটা তুলে ধর, আর মশালের আলো ফেল ওর মুখের উপর। প্রভু টাকুমি নো-কামির তরোয়ালের লম্বা দাগ ছিল নো-সুকের গালে, এর মধ্যে নিশ্চয় সে দাগ মিলিয়ে যায়নি।"

আদেশ পালিত হওয়া মাত্র সব সৈনিক সমবেতভাবে জয়োল্লাস করে উঠল—"এই সেই, এই সেই, ঐ যে গালে লম্বা দাগ রয়েছে তরোয়ালের কোপের।"

তখন কোরান্‌সুকে সবিনয়ে বললে নো-সুকেকে—"আপনি মহৎ বংশের লোক। নিজের অপরাধের শাস্তি নিজেই গ্রহণ করুন। হারিকিরি করুন আপনি।"

কিন্তু ভীরু অপদার্থ, সামুরাই নামের অযোগ্য ঐ নো-সুকে হারিকিরির নামে কুঁকড়ে গেল ভয়ে। নিজের পেট নিজে চিরে ফেলা, নাড়িভুঁড়ি উপড়ে ফেলা নিজের হাতে? ওরে বাপ্! নো-সুকে তা পারবে না। পারবে না।

অগত্যা কোরানসুকেই শিরশ্ছেদ করলেন তার। আর রাত্রি প্রভাত হতেই মিছিল করে সেই ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে চললেন সেই সমাধিক্ষেত্রে, যেখানে তাঁর প্রভুকে সমাধি দেওয়া হয়েছিল বর্ষকাল আগে।

দেশের লোক সবাই এসে যোগ দিল সেই মিছিলে। সবাইয়েরই মুখে স্বর্গীয় টাকুমির গুণ-কীর্তন আর তাঁর প্রভুভক্ত রোনিনদের সাধুবাদ। পথের মাঝে সেণ্ডাইয়ের রাজা এই সাতচল্লিশ বীরকে নিমন্ত্রণ করে নিজের প্রাসাদে নিয়ে গেলেন, তাঁদের কিছু খাইয়ে দেবার জন্য।

নো-সুকের ছিন্নমুণ্ড টাকুমির আত্মার তৃপ্তি-বিধানের জন্য উৎসর্গ করার পরে কোরান্‌সুকে সম্রাট দরবারে সংবাদ পাঠালেন—"প্রভু টাকুমি নো-কামির অন্যায় হত্যার প্রতিশোধ আমরা নিয়েছি। এজন্য সম্রাট যে-শাস্তি আমাদের দিতে চান, আমরা তা নিতে প্রস্তুত। আমরা প্রভুভক্ত, কিন্তু রাজদ্রোহী নই।"

সম্রাট দরবারে নো-সুকের বন্ধুরা যথেষ্ট প্রতিপত্তির অধিকারী। তাদের সুপারিশে সম্রাটের নামে আদেশ প্রচারিত হল—ঐ সাতচল্লিশ বীর হারিকিরি করুক।

অম্লান বদনে করলেন তাঁরা হারিকিরি, খোলা মাঠের ভিতর, উজ্জ্বল দিবালোকে, সমগ্র জাতির সশ্রদ্ধ অভিনন্দনের মধ্যে।

সাতচল্লিশ বীরের মৃতদেহ নিয়ে সমাধি দেওয়া হল টাকুমির সমাধিকে ঘিরে। সে সমাধিক্ষেত্র আজও বীরধর্মী জাপানীদের তীর্থক্ষেত্র হয়ে আছে।*

* অজ্ঞাতনামা জনৈক মধ্যযুগীয় জাপানী লেখক-রচিত সত্যঘটনামূলক কাহিনী "দ্য ফর্টিসেভন্ রোনিনস" অবলম্বনে।

ছাব্বিশ ভায়ের কাহিনী

শ্রীবলরাম দাস

এক

শত শত বৎসর আগে সমুদ্রের ওপারে কোন এক গ্রামে একজন লোক বাস করতেন। তিনি ছিলেন যেমন বুদ্ধিমান তেমনি দূরদর্শী। গঠনমূলক কাজে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তা ছাড়া যে কোনরকম ঝগড়া, মনোমালিন্য, অনৈক্যকে তিনি অতি সহজ উপায়ে মিটমাট করে দিতে পারতেন। সেজন্য তিনি ছিলেন সকলের শ্রদ্ধাস্পদ।

মহাভারতে পাণ্ডুর যেমন কুন্তী আর মাদ্রী নামে দুই স্ত্রী ছিল, তেমন এই লোকটারও দুই স্ত্রী ছিল। প্রথমা স্ত্রীর ছিল পাঁচটি সন্তান। ভদ্রলোক এদের নাম রেখেছিলেন—A, E, I, O, U, দ্বিতীয়া পত্নীর কোন পুত্র ছিল না। তাই দুই পত্নীর মিলিত স্নেহে ও যত্নে A, E, I, O, U মানুষ হতে লাগল। দুই স্নেহময়ী মা আর বুদ্ধিমান স্নিগ্ধমেজাজী পিতার কঠিন পরিশ্রম ও সঠিক শিক্ষা-দীক্ষায় A, E, I, O, U খুব বুদ্ধিমান হয়ে উঠল। দ্বিতীয়া পত্নীর কোন পুত্র-কন্যা না থাকার দরুন মন মাঝে মাঝে কাঁদত। ভদ্রলোক তাঁর হৃদয়-ভেদী দৃষ্টি দিয়ে দ্বিতীয় স্ত্রীর অন্তরের এই শূন্যতা দেখতে পেলেন। তাই তিনি স্ত্রীর বেদনা মুছে দেবার জন্য বহু দেব-দেবীর কাছে সন্তান লাভের জন্য মিনতি জানালেন। বিধাতার কাছে একমনে যে কোন জিনিস চাইলে পাওয়া যায়। তিনি আমাদের সকলের পিতা, সন্তানের চাহিদা মেটাবার জন্য তাঁর ভাণ্ডারে অফুরন্ত ঐশ্বর্য আছে। প্রয়োজন মত চাইলেই পাওয়া যাবে। আমাদের দেশের রামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ যা চেয়েছিলেন তাঁর কাছে, তিনি দু'হাত ভরে তাই দিয়েছিলেন। বিধাতা তাঁর উপাসনায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকেও আশীর্বাদ করলেন। কালক্রমে তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী ২১টি সন্তানের জননী হলেন। ভদ্রলোক এদের কি নাম রাখবেন ঠিক করতে পারলেন না। তিনি লক্ষ্য করলেন এরা A, E, I, O, U-র মত ততটা চালাক চতুর বা বুদ্ধিমান নয়। ভবিষ্যতে এদের ঠকে যাবার সম্ভাবনা আছে। তাই তারা যাতে তাদের ৫ বড় দাদা A, E, I, O, U-র উপর কিছুটা নির্ভরশীল হয়ে থাকে সেই চেষ্টা করলেন। এক সুতোয় ছাব্বিশটা ছেলেমেয়ে যাতে বাধ্য থাকে তার জন্য অজস্র চিন্তা করলেন। অবশেষে A, E, I, O, U-র নামের উপর ভিত্তি করে তিনি একুশ ছেলের নাম করলেন। নামকরণের দ্বারা তিনি বুঝিয়ে দিতে চাইলেন যে, তারা তাদের বড় ভাইয়ের উপর নির্ভরশীল। যেমন B (বি) উচ্চারণে E (ই) আসে। ই (E) ছাড়া বি (B) উচ্চারণ হতেই পারে না। এইভাবে তিনি একুশটি ছেলেমেয়ের নাম রাখলেন B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. এদের প্রত্যেকের নামের উচ্চারণে A, E, I, O, U এসে থাকে। এদের নামের ছোঁয়া ছাড়া ওদের ২১ জনের নাম উচ্চারণ সম্ভব নয়। এই নামকরণের পেছনে ভদ্রলোকের চিন্তা কি রকম কাজ করেছে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

নামকরণ ত হল। ছাব্বিশটা ছেলেমেয়ে নিয়ে ভদ্রলোককে কিছুটা অসুবিধার মধ্যেও পড়তে হল। প্রতিবার খাবার সময়ে A, B, C, D, E, F, G, H এইভাবে পর পর ছাব্বিশ জনকে ডাকা একটি কষ্টকর ব্যাপার নয় কি? কি করা যায়? মনে রাখাও সব সময় সম্ভব নয়! কিন্তু এটাও ঠিক, এ পৃথিবীতে কোন কিছু অসম্ভব নয়—বিশেষ করে এমন একজন বুদ্ধিমানের কাছে। তাই

তিনি ছাব্বিশ জনের ALPHABET (অ্যালফাবেট) নামে একটা নাম রাখলেন। অ্যালফাবেট বলে হাঁক দিলেই ছব্বিশ জন সুড়সুড় করে এসে খাবার টেবিলে হাজির হত।

ছাব্বিশ জন ভাই-বোনের মধ্যে ভীষণ ভাব ছিল। তারা এক সঙ্গে খেলত, বেড়াত, মাছ ধরত, গুলতি নিয়ে শিকার করত, আরও কত কি করত। একটুকরো খাবার পেলে ছাব্বিশ জনে ভাগ করে খেত। একজনের অসুখ করলে পঁচিশ জনে সেবা করত। কিন্তু পৃথিবীতে শয়তানের অভাব নেই! শয়তান হল পরশ্রীকাতর, পাপীর সহায়ক। যে কোন ভাল জিনিসকে ধ্বংস করাই তার কাজ। এই সুন্দর, ঝলমলে পৃথিবীকে সে অসুন্দর, ম্লান করতে চায়। সৃষ্টিকে সে দু'চক্ষে দেখতে পারে না, কেন না সে সৃষ্টি করতে পারে না। হিংসুটে এক শয়তান তাই এদের ছাব্বিশ জনের একতা, পরস্পরের প্রতি সুগভীর ভালবাসার মাঝে ভাঙন ধরাতে এগিয়ে এল। নানারকম খুনসুড়ি করে, বিষমন্ত্রের সাহায্যে সে এদের ছাব্বিশ জনের একতাকে দিল চূর্ণ-বিচূর্ণ করে। ফলে দুই মায়ের সন্তানদল দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল। ওরা পাঁচজনে মিলে একদল হয়ে গেল। দলের নাম হল VOWEL (ভাওয়েল)। এদের একুশ জনের দলের নাম হল CONSONANT (কনসোন্যাণ্ট)।

নিজের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে দেখে শয়তানের সে কি হাসি, সে কি আনন্দ! সেদিন সন্ধ্যাবেলা খাবার সময় যখন তাদের বাবা তাদের 'অ্যালফাবেট' বলে হাঁক দিলেন, সকলে টেবিলে হাজির হল না। তখন তাদের নাম ত আর 'অ্যালফাবেট' নয়। ছেলেদের দুর্মতি দেখে বাবার মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। তিনি তাদের প্রত্যেককে এক এক করে ডাকলেন—সব কথা শুনলেন। দু'দলের নূতন নামও শুনলেন, কিন্তু সেদিন এসব ব্যাপার নিয়ে টুঁ শব্দটিও করলেন না।

—কি ভাবে এ ভাঙ্গনে জোড়া লাগান যায়? কি ভাবে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব? সারাটা রাত এই দুই চিন্তা তাঁকে ঘুমোতেই দিল না। এক সুতোয় গাঁথা মালা শয়তান এসে ছিঁড়ে দেবে, এটা তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারবেন না। একতা ওদের মধ্যে ফিরিয়ে আনতেই হবে।

পরদিন সকালবেলা আকাশ ছিল মেঘলা। আকাশের বুকে সূর্য একবার পানকৌড়ির মত ভুস করে ভেসে উঠছে আবার পরক্ষণেই ডুবে যাচ্ছে। মেঘলা হলেও দিনটা বেশ মনোরম। ভদ্রলোক শান্তভাবে ছেলেদের ডাকলেন। সে ডাকে একটু রসিকতা মেশানো ছিল।

'Vowel-এর দল, ওহো Vowel-এর দল। Consonant, ওহো Consonant-এর দল! কোথায় গেলে তোমরা সব, এদিকে এস।'

দু'দল দু'দিক থেকে বৈঠকখানায় এসে হাজির হল। ভদ্রলোক বললেন, 'আজ দিনটা মেঘলা হলেও বেশ মনোরম। ক্যাক্টাস গাছের গন্ধহীন ফুল, মিঠে বাতাস, লার্কের মধুর ডাক আর এদিকে রান্নাঘর থেকে ভেসে আসা কপির জুসের আর সেঁকা রুটির গন্ধ সব মিলিয়ে দিনটা বেশ উপভোগ্য, তাই না?'

কেউ কোন উত্তর দিল না। W আর Y কিন্তু দু'দল ঘেঁষা। ওরা দু'জন বলল: 'হ্যাঁ বাবা, দিনটা সত্যই মনে রাখার মত।'

'আজ তাহলে সকলে মিলে একটু স্যামসন পাহাড়ের দিকটা ঘুরে আসা যাক।' বাবা মুচকি হেসে বললেন। বেড়াতে যাবার কথা উঠতেই সকলেই এক মুহূর্তে প্রফুল্ল হয়ে উঠল।

* * *

তৃণভূমির মাঝখান দিয়ে পায়ে চলা সরু ধূসর পথটা একটা ছোট পাহাড়ের গা লতার মত বেড় দিয়ে আঁকড়ে ধরে আছে। এদিকে ওদিকে

ঝোপে ঝাড়ে দু' একটা গাঢ় বেগুনী রঙের মেঠো ফুল ফুটেছে। উত্তর-পশ্চিমে মেষ-চারণ ক্ষেত্রে অসংখ্য ভেড়া চরছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় কতকগুলো সাদা, কালো পাথর দুলে দুলে এ ওর গায়ে ঠোক্কর মারছে। চাপা প্যান্ট পরা, মাথায় কোণবাঁকা টুপি, মুখে চুরুট টানতে টানতে এক বৃদ্ধ ভেড়াগুলোকে চরাচ্ছে আর মাঝে মাঝে মিটমিট করে দিগন্তের দিকে তাকাচ্ছে, আর অকারণে হাতের লাঠিটা দিয়ে নিজের পায়ে আলতোভাবে মারছে। সূর্য মেঘের দরজা দিয়ে উঁকি মেরেই দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। ভদ্রলোক ছাব্বিশ জন ছেলেমেয়েকে নিয়ে একটু দূরে এক ঝর্ণার ধারে এসে থামলেন। সত্যিই ভারী সুন্দর জায়গাটি! গাছগাছালিতে চারপাশ ভরা, পাখির কূজন, শুকনো পাতার সাথে বাতাসের খেলার মর্মর ধ্বনি স্থানটাকে মনে-রাখার-মত করে দিয়েছে।

এতক্ষণ এখানটা ছিল মেঘলা, ওদিকটা ছিল সূর্যকিরণে উজ্জ্বল। এবার এদিকটা হল আলোকিত আর ওদিকটা ম্লান। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন: 'আচ্ছা, বল ত কেন এমনটা হয়?'

কেউ উত্তর দিল না।

বাবা বললেন: 'আমিই বলে দিচ্ছি। সূর্যের ঐ জোরালো আলো একদল মেঘ যেই বুক পেতে আটকে দিচ্ছে অমনি আবছা অন্ধকার নেমে আসছে, এই হল এর কারণ। এখন বল দেখি, একটা মেঘের ছোট্ট টুকরো পারত ঐ শক্তিশালী আলোকচ্ছটাকে ঐ ভাবে ঢেকে দিতে? পারত না। কখনও পারত না। কিন্তু দেখ, দল বেঁধে একত্রিত হয়েছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। তোমরা যদি ওইভাবে নিজেদের একত্রিত করে রাখ, কেউ তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। যে কোন শক্তি তোমাদের কাছে মাথা নত করবে। অনেক কিছু সৃষ্টি একতার দ্বারাই করা যায়। A, E, I, O, U ওরা তোমাদের বড় ভাই। ওদের কথা সব সময় শুনবে। B, C, D, E, F, M, N, P, R, T তোমরা ওদের ছোট, তোমরা কখনও ওদের সঙ্গ ছাড়বে না। কোথাও গেলে, কোন কাজ করতে হলে ওদের একজনকে হোক বা দুজনকে হোক সঙ্গে নেবে, কোনদিন বিপদ হবে না। বড়দের কথা সর্বদা মানতে হয়, তা ছাড়া ওরা বুদ্ধিমানও বটে।'

সেই থেকে ওরা আবার ঝগড়া-বিবাদ ভুলে এক হয়ে গেল। শুধুমাত্র দু' দলের দুটো নাম রয়ে গেল। একদিন B, O আর Y এরা তিন ভাইয়ে খেলছিল। মা ডাকলেন: 'B, O, Y, এদিকে এস।'

বাবা বললেন: 'ওভাবে ডাকতে অসুবিধা হচ্ছে না? তার চেয়ে ওদের তিনটে নাম এক করে নাও। B, O, Y এই তিন নাম মিলে কি হচ্ছে? BOY (বয়)। ওদের বয় বলে ডাকো।' এইভাবে কখনও M, A আর N তিনজনে মিলিত হত। বাবা ডাকতেন: 'ম্যান, খাবে এস।' কখনও F, L, O, W, E আর R ছ'জনে পুকুরে সাঁতার কাটছে, মা সকলের নাম জুড়ে ডাকলেন: 'FLOWER, উঠে পড়, অসুখ করবে।' নানাজনে নানাভাবে এইভাবে মিলিত হবার দরুন বার বার নূতন নামের সৃষ্টি হত। সেই থেকে ইংরেজীতে এত নামের সৃষ্টি হয়েছে। এরা যখনই মিলিত হত তখনই বাবা খুব আনন্দ পেতেন। তাঁর এই আনন্দের নাম WORD (ওয়ার্ড)। শয়তান শত চেষ্টা করেও আর ওদের বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব ভাঙতে পারল না। আজও ওদের একতা অটুট রয়েছে, বন্ধন এতটুকুও শিথিল হয়নি। বাবার কথা সব সময় মেনে চলছে। যখনি দলবদ্ধ হচ্ছে, বড় ভাইদের একজনকে দলে রাখছেই।

ঠিক বলেছ। ইস্ তোমার কি বুদ্ধি। কোকিলের ডাক শুনে, ফাঁদ ভাববে- শর্ত অনুযায়ী তার যাওয়ার সময় হয়েছে। আর আমি ওকে এক ধামা টাকা দিয়ে বিদায় করে দেব।
পরের দিন খুব ভোরে, হরনন্দদাস তার বৌয়ের সারা গায়ে আঠা দিয়ে পালক এঁটে দিল।
তারপর হরনন্দদাসের বৌ একটা গাছের ডালে বসে কোকিলের মত ডাকতে লাগল
কু--হু....
কু--হু...
আরে- আমি যেন কোকিলের ডাক শুনতে পাচ্ছি!
হাঁ-হাঁ-কি আশ্চয্য! কোকিলের ডাকই তো শুনতে পাচ্ছি যেন? ফাঁদ তোমার চাকরির মেয়াদ শেষ হয়েছে। এখন তুমি এক ধামা টাকা নিয়ে বাড়ী যাও।

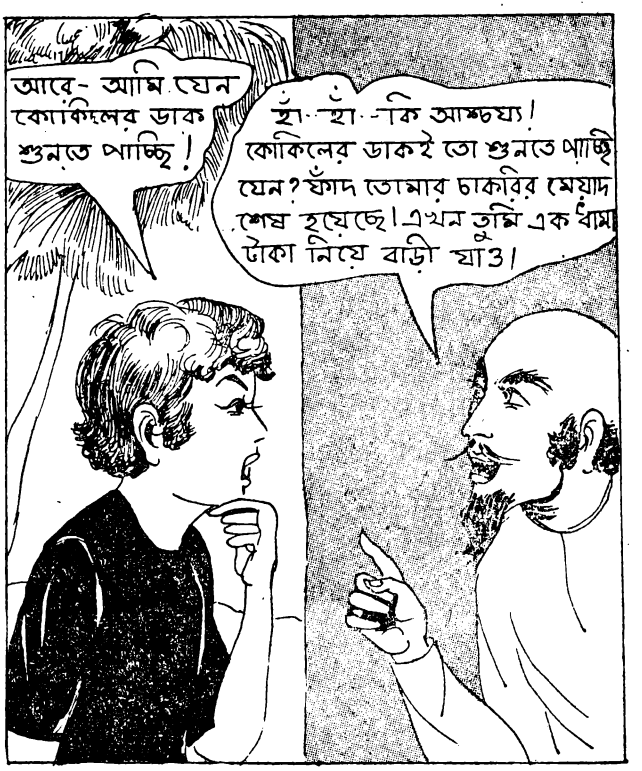

কিন্তু ফাঁদ সে কথায় কান না দিয়ে বাগানের দিকে যায়।
একী ব্যাপার? কোকিল আবার এত বড় হয় নাকি! আরে—হরণদাসের বৌ এর পায়ে যেমন মল, এর পায়েও তো সেই রকম মল!
এই হ্যাট—হ্যাট—যা এখান থেকে
উড়ছে না দেখে ফাঁদ একটা লাঠি নিয়ে তাড়া করে।
দাঁড়াও কেমন করে উড়তে হয়, তোমাকে শেখাচ্ছি।

(চলবে)

জীবন কোথায় নেই ?

শ্রীবৈজ্ঞানিক

[আর্থার সি. ক্লার্ক-এর "বিফোর ইডেন" অবলম্বনে]

"এই বোধ হয় পথের শেষ"—

জেরি গারফিল্ড এঞ্জিন থামিয়ে দিয়ে বলল—"আর এগুনো সম্ভব নয়।"

পেটের নীচের পাইপ থেকে প্রথমে ভস্ ভস্, পরে হিস্ হিস্ করতে করতে গ্যাস বেরিয়ে গেল খানিকটা, তারপর সব নিশ্চুপ। চুপসে গিয়েছে হাওয়ার গদি, যার উপর ভর রেখে পাথরে পাথরে বুক ঘষে ঘষে সাপের মত পথ চলে টহল-গাড়ি "র‍্যাম্‌ব্লিং রেক্"। হেস্‌পেরিয়ান অধিত্যকার মোচড়-খাওয়া অষ্টাবক্র পাথরের চাঙড় একটা, তারই উপরে সে এলিয়ে পড়ল গভীর অবসাদে।

না, নেই। পথ নেই এগিয়ে যাবার। জেট বল, ট্র্যাক্টর বল, কোন-কিছুই ঐ খাড়া পাহাড়ের উপর দিয়ে ঠেলে পার করে দিতে পারবে না 'এস—৫'কে'। 'মর্নিং স্টার' বিমানের সরকারী তালিকায় ঐ নামই লেখা আছে র‍্যাম্‌ব্লিং রেক-এর। এস-৫।

দক্ষিণ মেরু আর মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে। মানে, শুক্রের দক্ষিণ মেরু, পৃথিবীর নয়। মাত্রই ত্রিশ মাইল। কিন্তু অবস্থা যা দাঁড়াল, ঐ ত্রিশটা মাইল পেরুনো ঠিক যেন শুক্র থেকে নেপচুনে পাড়ি দেওয়ার মতই অসম্ভব ঠেকছে। ফিরে যেতে হবে। নির্ঘাৎ ফিরে যেতে হবে চারশো মাইলের এই দূরত্বটা অতিক্রম করে, যার প্রতি ইঞ্চি পথ এমন বিপৎসংকুল যে তার কথা ভাবতে গেলেই বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে।

কিন্তু আবহাওয়া? আশ্চর্যরকম পরিষ্কার। যে কোন দিকে হাজার গজ পর্যন্ত স্পষ্ট চোখে পড়ছে। রাডার লাগছে না, সমুখের ঐ গিরিচূড়াটা পর্যবেক্ষণ করতে; খোলা চোখেই সব কিছু লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে আছে একটা সুকোমল সবুজ মেরুজ্যোতি। সে যেন চুইয়ে পড়ছে ঐ আলগা হালকা মেঘপুঞ্জ থেকে, যা বহু লক্ষ বৎসর ধরে ক্রমাগত পাক খাচ্ছে শুক্রের শূন্যদেশে।

আলোটা সবুজ, দূরের জিনিস সব কিছুই কুয়াশায় অস্পষ্ট, মাঝে মাঝেই মতিভ্রম হয়—আমরা কি জলের তলায় চলছি-ফিরছি নাকি? এটা কি পাহাড়ের পিঠ? না, অগভীর কোন সমুদ্রতল? জেরির ত একবার মনে হল—মাছের ঝাঁক সাঁতরে যাচ্ছে মাথার উপর দিয়ে।

কিন্তু আষাঢ়ে ভাবালুতার প্রশ্রয় জেরি কখনও দেয় না। রূঢ় বাস্তবের দিকে সঙ্গীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেই বলল—"তাহলে বিমানে বলে পাঠাই যে আমরা ফিরে আসছি—?"

"আরে না, না।" ব্যস্ত হয়ে নিষেধ করলেন ডক্টর হাচিন্স—"একটু ভাবতে দাও আমায়—"

জেরি তাকাল দলের তৃতীয় সদস্যের দিকে। সে তাকানোর মানেই হল—"আপনি একটু বোঝান ডক্টরকে"—

কিন্তু এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। খামখেয়ালিপনায় তৃতীয় সদস্য কোলম্যানও কম যান না হাচিন্স-এর চেয়ে। যে দুর্বার অনুসন্ধিৎসাকে খামখেয়ালি ছাড়া অন্য কিছু বলে ভাবতে পারে না ইঞ্জিনিয়ার মনিষ্যি কাঠখোট্টা জেরি। কোলম্যানেরও তা পুরোমাত্রায় আছে।

হাচিন্স-এর মত কোলম্যানও বিজ্ঞানী। দুই বিজ্ঞানীতে তর্কাতর্কির কুকুর-কুণ্ডলী অবশ্য লেগেই আছে সর্বদা। মতের মিল তাঁদের কখনো যদি দেখা যায়, তবে তা হল মাত্র ঐ একটা বিষয়েই—"প্রাণ দিয়েও অভিযান সার্থক করব।"

"দুটোই পাগল! বিজ্ঞানী মানেই হিতাহিত-জ্ঞানহীন!"—মনে মনে মন্তব্য করে জেরি।

কিন্তু সে মন্তব্য মুখে প্রকাশ করার অধিকার ত জেরির নেই! একটা মৃদু প্রতিবাদ মাত্র করল সে, তাও অস্ফুট গুঞ্জনে! ওরই মারফতে নিজের বিবেককে সান্ত্বনা দিয়ে তারপর সে স্থির হয়ে বসে রইল, হাচিন্স-এর ভাবনা কখন শেষ হবে, তারই প্রতীক্ষায়।

ক্ষুদে একটুখানি কেবিন 'এস-৫'-এ। তারই ভিতর পায়চারি করছেন হাচিন্স, আর কখনও দাঁড়িয়ে পড়ছেন দেয়ালে ঝোলানো কোন চার্টের সমুখে, কখনও বা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন তাকে সাজানো কোন যন্ত্রপাতি। হঠাৎ গাড়ির সন্ধানী আলোটার মুখ তিনি ঘুরিয়ে দিলেন সমুখের গিরিশিখরের দিকে, আর দূরবীন চোখে লাগিয়ে তার আগা-পাস্তলা পরীক্ষা করতে লাগলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

কোলম্যান সাগ্রহে তাকিয়ে আছেন, কখন হাচিন্স তাঁর হাতেও একবার দেবেন দূরবীনটা।

আর জেরি? সে ভয়েই তটস্থ—এখনই বুঝি হাচিন্স তাকে হুকুম করে বসেন ঐ শিখরের গা বেয়ে উপর পানে গাড়ি চালিয়ে দিতে! বিজ্ঞানী ত! বিশ্বাস নেই ওঁদের, ওঁরা হয়ত ভুলেই যাবেন যে এস-৫ একখানা গাড়ি মাত্র, পাহাড়ে ছাগল সে নয়।

হঠাৎ গলা দিয়ে এক ঝলক হাওয়া বার করে দিলেন হাচিন্স সশব্দে, আর কোলম্যানকে বললেন

হাচিন্স দূরবীন চোখে লাগিয়ে আগা-পাস্তালা পরীক্ষা করতে লাগলেন।

—"দেখ, দেখ—ঐ কালো দাগটার ঠিক পাশে! কী দেখছ, বল ত!"

দূরবীনটা কোলম্যানের হাতে তুলে দিলেন ডক্টর।

এবার হাঁক করে ওঠার পালা কোলম্যানের।

"জব্দ! ডাহা জব্দ হয়ে গেলাম সত্যি!" অবশেষে বললেন তিনি—"ঠিকই তুমি বলেছিলে ডক্টর! আছে, নদী আছে শুক্রগ্রহে। শুকনো বটে, কিন্তু ওটা জলপ্রপাত ছাড়া অন্য কিছু হতেই পারে না।"

"তা হলে স্বীকার করছ যে বাজি হেরেছ তুমি? কেম্‌ব্রিজে ফিরব যখন, বেল গুর্মেট-এ খাওয়াতে হবে একটা ডিনার। শ্যাম্পেন সমেত—।"

কোলম্যান খুশী হবেন কেমন করে? বাজি হেরে কে কবে খুশী হয়? বিশেষ হেরে যাওয়ার দরুন যদি নগদ গচ্ছা দিতে হয়? বিরস বদনে তিনি বললেন—"মনে করিয়ে না দিলেও চলবে। কিন্তু নদীর কথা ছাড়াও অন্য অনেক কথা বলেছ তুমি। সেগুলো এখনও প্রলাপের পর্যায়ে রয়ে গিয়েছে, তা মনে রেখো।"

জেরি আর চুপ করে থাকতে পারল না। দুই বিজ্ঞানীর কথার মাঝে অজ্ঞানের মতই সে বলে উঠল—"এ সব কী বলছেন আপনারা? নদীর কথা? জলপ্রপাতের কথা? ওসব যে শুক্রে থাকতে পারে না, তা ত শিশুরাও জানে! গ্রহটা ত গরম বাষ্পে তুর্কী হামাম হয়ে আছে। মেঘ কখনও এমন জমাট বাঁধে না এখানে, যা থেকে বৃষ্টি হতে পারে।"

হাচিন্স একেবারে ভিজে বেড়ালের মত নিরীহ। অতিমাত্র বিনয়ের সঙ্গে বললেন—"থার্মোমিটারের দিকে শেষ কবে তাকিয়েছিলে?"

"তা, কয়েকদিনই হল বোধ হয়।"—স্বীকার করতে বাধ্য হয় জেরি, যদিও তার মন্তব্যের সঙ্গে থার্মোমিটারের যোগাযোগটা কোথায়, হঠাৎ তা বুঝে উঠতে পারে না।

"তাহলে একটা খবর দিই, শোন"—জবাব দিলেন ডক্টর—"তাপ নেমেছে দুই শো ত্রিশে, আরও নামছে, নামবে। এই কয়েকটা কথা মগজে আনবার চেষ্টা কর—প্রথমতঃ, আমরা প্রায় মেরুতে এসে গেছি, দ্বিতীয়তঃ কালটা শীত ঋতু, তৃতীয়তঃ, সমতল থেকে আমরা ছয় হাজার ফুট উপরে আছি এখন। হাওয়াতে শীতের কামড় টের পাচ্ছ না? তাপ যদি আর কয়েকটা ডিগ্রি কমে, বৃষ্টি হবে। জল যা ঝরবে, তা ফুটন্ত গরম বটে, তবু জল। জর্জ কোলম্যান স্বীকার করুন বা না করুন, শুক্র সম্পর্কে আমাদের সব ধারণা উলটে যেতে বসেছে এইবার।"

"কেন? কেমন করে?" জেরি জিজ্ঞাসা না করে পারে না, যদিও সে আগেই আন্দাজ করতে পেরেছে যে, তার প্রশ্নের উত্তরটা হবে কী।

উত্তর হল এই—যেখানে জল, সেখানেই জীবন। যেহেতু শুক্রের গড়পড়তা উত্তাপ হল পাঁচশো ডিগ্রির উপরে, আমরা একথা গোড়া থেকেই ধরে নিয়েছি যে, গ্রহটা অবশ্যই হবে নিষ্প্রাণ। কিন্তু এখানে এসে অবধি দেখছি যে, অন্ততঃ এই অংশটা শুক্রের অনেকটা ঠাণ্ডা। সেই কারণেই আরও, মেরুতে পৌঁছোবার জন্য এত ব্যস্ত আমি। এই পার্বত্য অঞ্চলে হ্রদ-টদ আছে হয়ত, দেখতে চাই তাদের।"

"কিন্তু জল যদি পড়েও কখনও"—তর্ক তোলেন কোলম্যান—"ফুটন্ত জলে কোন প্রাণী বাঁচবে?"

"আমাদেরই পৃথিবীতে অনেক সামুদ্রিক উদ্ভিদ আছে, যারা পায়ে ফুটন্ত জলে বাঁচতে"—জবাব দিলেন হাচিন্স—"গ্রহান্তর নিয়ে গবেষণা শুরু করবার পরে প্রথম যে-তথ্যটি আমরা জেনেছি, তা হল এই যে, প্রাণশক্তির টিকে থাকা যেখানে সম্ভব, সেইখানেই উদ্ভব হবে প্রাণীর। শুক্রেও সে-সম্ভাবনা আছে বলে মনে হচ্ছে যেন—"

"তোমার ধারণাটা সত্য কিনা, যাচাই করে দেখতে পারলে হত ভাল"—বললেন কোলম্যান —"কিন্তু দেখছই ত, যাচাই করা সম্ভব নয়। গাড়ি ত পাহাড়ে উঠবে না।"

"না, গাড়ি উঠবে না।" স্বীকার করলেন হাচিন্স—"কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই পারব উঠতে। এই তাপ নিবারক পোশাক পরেও পারব। মেরুর দিকে কয়েকটা মাইল মাত্র হাঁটা। রাডারে যে

ম্যাপ ধরা পড়েছে, তাতে ত দেখা যায়, পাহাড়ের মাথায় উঠতে পারলে তারপরে জমিনটা প্রায় সমতল। ধর, মেরুতে পৌঁছোতে ঘণ্টা বারো লাগুক ? এর চেয়েও খারাপ পরিবেশে, বারো ঘণ্টা কেন, বাইশ ঘণ্টাও আমরা বাইরে বাইরে কাটিয়েছি অনেক সময়।"

কথা ঠিক। পৃথিবীতেও "ডেথ ভ্যালি" আছে। তার চেয়ে মাত্র একশো ডিগ্রি বেশী গরম এই শুক্রের সমতল। সেই ডেথ ভ্যালিতে মানুষ থাকে ত! তাপ-নিবারক পোশাক না-পরেই টিকে থাকে। শুক্রে তবে তাপহরণ পোশাক পরে—

কোলম্যান কাজের কথা পাড়লেন এইবার—"নিয়ম হল এই যে, একা কেউ কোথাও যাবে না। আবার সবাই যাওয়ারও উপায় নেই, গাড়ির কাছে একজন থাকা চাই। তা হলে লটারি করতে হয়, কে যাবে তোমার সাথে, কেই বা থাকবে এখানে। কিসের লটারি করা যায়, বল দেখি! দাবা, না তাস ?"

"দাবায় সময় লাগবে ঢের"—মাথা নাড়লেন হাচিন্স। চার্টের টেবিল থেকে পুরানো তাস এক সেট টেনে নিয়ে এসে জেরিকে বললেন—"ফাট হে!"

জেরি টেনে বার করল ইস্কাবনের দশ।

—"তুমি নিশ্চয় ওর উপরে থাকবে জর্জ।" শুভেচ্ছা জানালেন ডক্টর।

"ধুত্তোর! চিড়েতনের পাঞ্জা!"—কোলম্যান মুখটা বিকৃত করে বললেন—"শুক্রের প্রাণীদের আমার নমস্কার দিও হে জেরি—"

হাচিন্স বলেছিলেন বটে যে, পাহাড়ে ওঠা শক্ত হবে না এমন কিছু। কিন্তু কার্যকালে অন্যরকম দেখা গেল। খাড়াই যে খুব বেশী, তা নয়, কিন্তু বোঝা ত বইতে হচ্ছে কম না। অক্সিজেনের সরঞ্জাম, তাপ নিবারক পোশাক এবং অবশ্য-প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি—সবে মিলিয়ে মাথাপিছু একশো পাউণ্ড অন্ততঃ বইতে হচ্ছে। সে অবস্থায় চড়াই ওঠা—পরম শত্রুকেও যেন এমন বিপদে না পড়তে হয় কখনো।

অভিকর্ষ কম। পৃথিবীর তুলনায় শতকরা তেরো ভাগ কম। তার দরুন একটু সুবিধা অবশ্যই রয়েছে, কিন্তু সেই জলের তলার মত গোধূলি আলোতে কখনো পাথরের গা বেয়ে উঠছি টিকটিকির মত, কখনো একটু আলিশার মত বাড়ন্ত পাথর ধরে হাঁফ ছেড়ে নিচ্ছি এক মিনিট। তারপরই আবার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি উপরের কোন অবলম্বন আঁকড়ে ধরার জন্য—সবে মিলিয়ে সে যেন একটানা দুঃস্বপ্ন একটা। কিন্তু মরি মরি। ঐ সবুজ আলোটা! আকাশ বাতাস সব-কিছুকে ম্লান করিয়ে দিচ্ছে যেন! পৃথিবীর চাঁদের আলো এর কাছে কোথায় লাগে ? জেরি ভাবে—শুক্রের চাঁদ নেই, তার জন্য দুঃখও নেই। এখানে চাঁদ করত কী ? মেঘের আড়ালে ঢাকাই থাকত চিরদিন। আর তা না থাকলেও এই মেরু-জ্যোতির কাছে সে চাঁদের আলো দাঁড়াতেই পারত না। তা ছাড়া, সমুদ্রও ত নেই এখানে যে, তাতে জোয়ার ভাটা খেলবে সেই চাঁদের আকর্ষণে!

দুই হাজার ফুট উঠবার পরে তবে একটু সোয়াস্তি পেলেন আরোহীরা। এর উপরে আর চড়াই নেই তেমন, যা আছে—তাকে বলা যায় ঢালু সমতল একটা। সেই সমতলের বুক চিরে চিরে এমন-সব খাত রয়েছে চারিদিকে, বহতা জল ছাড়া অন্য কিছুর দরুন যাদের সৃষ্টিই হতে পারত না। খানিকটা পরেই তাঁরা এমন একটা খাত আবিষ্কার করলেন, প্রসার বিচার করে যাকে অনায়াসে নদী-নাম দেওয়া যেতে পারে।

ঐ খাত ধরে কয়েক শো গজ চলবার পরে জেরি বলল—"একটা কথা ভাবছি ডক্টর! হঠাৎ

ঝড় ওঠে যদি? আপনিই না বলছিলেন যে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে? গরম জল মাথার উপরে তোড়ে নামছে আকাশ থেকে, এ কল্পনাতে আনন্দ নেই।"

বিরক্ত হয়ে হাচিন্স জবাব দিলেন—"ঝড় যখন আসবে, জানান দিয়ে আসবে হে! আগে তার আওয়াজ উঠবে একটা, আমরা উঁচু পাহাড়ে উঠে পড়বার সময় পাব।"

হাচিন্স হয়ত ঠিকই বলেছেন, কিন্তু জেরি বেচারী কোন আশ্বাস পাচ্ছে না তাঁর কথায়। পাহাড়ের গা ছেড়ে এই সমতলে ঢুকবার পর থেকেই রেডিওর যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তারা। সাথীদের সঙ্গে সংস্রব কেটে যাওয়া এ-রকম স্থানে খুব মারাত্মকই হয়ে উঠতে পারে। এ-রকম অবস্থা আগে আর কখনো হয়নি জেরির।

মর্নিং স্টারে যতক্ষণ তারা ছিল, পৃথিবী থেকে দশ কোটি মাইল দূরে এসেও মনে হত আত্মীয়-পরিজনরা এখনও নাগালের মধ্যেই আছে। রেডিও মারফত দুই-চার মিনিটের মধ্যেই তাদের কাছে নিজের খবর পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হত, অথবা পেতে পারা যেত তাদের কুশলবার্তা। কিন্তু এখন? কয়েক গজ চড়াই তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে বাদবাকী মানবজাতির থেকে। এখানে যদি তাদের ভাগ্যে কিছু ঘটে যায়, কেউ জানতেও পারবে না তা, যদি নাকি ভবিষ্যতে কোন নতুন অভিযান এসে তাদের মৃতদেহ আবিষ্কার না করে এই পর্বতচূড়ার শুকনো নদীর খাতে।

জর্জ কোলম্যান? তিনি আসছেন না খোঁজ নিতে। তিনি এস-৫-এ বসে আছেন। নির্দিষ্ট কয়েকটা ঘণ্টা থাকবেন বসে। তার মধ্যে হাচিন্স আর জেরি ফিরে না গেলে টহল-গাড়ির মুখ ফিরিয়ে তিনি ফিরে যাবেন মর্নিং স্টারে। ব্যস!

মেরুর দিকে তিন মাইল অগ্রসর হওয়ার পরে হাচিন্স আবার দেখলেন থার্মোমিটার—"আরও নেমেছে তাপ। একশো নিরানব্বুই এখন। শুক্রের পিঠে এত কম উত্তাপের কথা এর আগে শোনেনি কেউ। চেষ্টা করে দেখ না জেরি, জর্জকে খবরটা জানানো যায় কিনা রেডিওতে।"

জানানো যে যাবেই না, জেরি তা সুনিশ্চিত জানে। তবু ভক্টরের কথায় সে চেষ্টা শুরু করল। এস-৫-এর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা ত বটেই, দূরবর্তী মর্নিং স্টারের সঙ্গেও। এ গ্রহের ঈথার-তরঙ্গে আরোহ-অবরোহ কোথায় কী আছে, তা ত জানা নেই তেমন! হয়ত নিকটের চাইতে দূরের কোন বিন্দুতে সাড়া জাগানো সহজ হতেও পারে।

কিন্তু কই? কোথায় ঝড় শুরু হয়েছে কে জানে, তারই আওয়াজ ছাড়া অন্য কিছু কানে আসে না। শব্দবাহী তরঙ্গ একটাও ধরা পড়ে না যন্ত্রে।

যাক। না হল নেই। হাচিন্স এগিয়ে চলেছেন আবার। হঠাৎ তিনি থেমে পড়লেন এক জায়গায়—কয়েকটা যন্ত্র নিয়ে কয়েক মিনিট নাড়াচাড়া করে বলে উঠলেন—"কী দেখলাম, জানো জেরি? অক্সিজেনের পরিমাণ এখানকার হাওয়ায় বেশী। দশ লক্ষে পনেরো ভাগ। টহল-গাড়িতে পেয়েছিলাম পাঁচ ভাগ, সমতলে ত মোটে আভাসই পাইনি বলতে গেলে।"

জেরি নাক সিঁটকে বলল—"পনেরো? তাতেই আপনি এত উৎফুল্ল? এক মিলিয়নে পনেরো? পনেরো ভাগ অক্সিজেনে কেউ শ্বাস নিতে পারে না কি?"

হাচিন্স রেগে উঠলেন—"তুমি একটা আস্ত গর্বেট। শ্বাস কে নিতে যাবে? অক্সিজেন তৈরি হচ্ছে, এইটিই হল বড় কথা। তৈরি করছে কেউ-না-কেউ। পৃথিবীর কথাই ধর। সেখানে অক্সিজেন

আসে কোথা থেকে ? জীবনী-শক্তিসম্পন্ন কোন কিছু থেকে। ধর, বাড়ন্ত উদ্ভিদ থেকে। পৃথিবীতে যখন উদ্ভিদ জন্মায়নি, সেখানকার হাওয়াও ঠিক এই শুক্রের মতই ছিল। কার্বন ডায়ক্সাইড, অ্যামোনিয়া আর মিথেনের একটা জগাখিচুড়ি মাত্র। তারপর উদ্ভিদ জন্মালো, উদ্ভিদই হাওয়াকে এভাবে পালটে দিল আস্তে আস্তে যে, একদিন তা জীবের শ্বাস নেবার যোগ্য হয়ে উঠল।"

"ওঃ, তাই বুঝি ?" বললে জেরি—"সে-প্রক্রিয়া শুক্রেও শুরু হয়েছে, বলছেন ?"

"মনে ত হয়, তাই"—উত্তর দিলেন হাচিন্স—"কোন-কিছু জিনিস যে অতি নিকটেই অক্সিজেন তৈরি করছে, সন্দেহ নেই তাতে। আর, সে কোন কিছু উদ্ভিদ ছাড়া আর কী হতে পারে ?"

জেরি মাথা নাড়তে নাড়তে বলল—"তা যদি হয়, উদ্ভিদের পরবর্তী ধাপই হবে জীব, নাকী বলেন ?"

যন্ত্রপাতি গুটিয়ে তুলে হাচিন্স বললেন—"অবশ্যই। তবে কিনা, জীবের আবির্ভাব হতে কয়েক কোটি বছর লেগে যেতে পারে এখনও—"

আরও কিছুদূর এগিয়ে যেতেই সব জল্পনার শেষ হল ওঁদের। সমুখে বিশাল এক হ্রদ। অনন্ত বারি সম্ভার নিয়ে কত দূরে দূরে যে প্রসারিত রয়েছে, তা চর্মচক্ষে ঠাহর পাওয়া যায় না। কিন্তু—

কথায় বলে জলই জীবন। কিন্তু এ হ্রদের জল দেখে জীবনের বদলে জেরির যা মনে পড়ল, তা হল মরণ। কালো একখানা দিগন্তবিস্তারী দর্পণ যেন পড়ে আছে পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে জড়িয়ে। দিগন্তসীমায় রাশি রাশি কুয়াশা, ফুটুড়ে বাষ্পের ধোঁয়াটে স্তম্ভ সারি সারি নৃত্য করছে জলের উপরে, ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে। এ কি বৈতরণী না কি ? খেয়া নিয়ে আসবে

হাচিন্স একটা শিশিতে হ্রদের জল ভরে ফেললেন খানিকটা।

চেরন * এক্ষুণি ? হাচিন্স আর জেরিকে ইহলীলা থেকে রেহাই দিয়ে ভবপারে নিয়ে যাওয়ার জন্য ?

হাচিন্স একটা শিশিতে হ্রদের জল ভরে ফেললেন খানিকটা, বিমানে গিয়ে বিশ্লেষণ করতে হবে ঐ জলের।

উনি জল নিয়ে ব্যস্ত, জেরি বলে উঠল—"ওটা কী ব্যাপার বলুন ত ?"

"কোন্‌টা ?" প্রশ্ন করলেন বটে হাচিন্স, কিন্তু উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই সেদিকে এগিয়ে গেলেন দ্রুতপদে। হ্রদের ধারেই দুটো শিলাস্তূপ,

* গ্রীক পুরাণের মতে বৈতরণীর মাঝি।

দুটোর ভিতরকার ব্যবধান কমে আসছে তিলে তিলে। কোন-একটা-কিছু যেন বুজিয়ে দিচ্ছে ব্যবধানটা।

কী ও? মনে হয় যেন একটা কালো কার্পেট। এক প্রান্ত তার হ্রদের জলে নেতিয়ে নেমে এসেছে। কালোয় কালো মিশেছে কোন্ যে মিলন রেখায়, তা দূর থেকে বুঝবার জো নেই।

"কার্পেট?" জেরি হাঁইফাঁই করছে উত্তেজনায়—"কিন্তু কার্পেট কি আপনি-আপনি বেড়ে যেতে পারে না কি? ঐ দেখুন, দুটো পাথরের ভিতর ফাঁক আর নেই বললেই চলে!"

"না, ফাঁক আর নেই।" উত্তেজনা হাচিন্সেরও কম নয়। তবে সে উত্তেজনা আধা-আধি মিশাল হল উল্লাসের—"ফাঁকটা গ্রাস করেছে ঐ কার্পেট। না, কার্পেট ও নয়, কার্পেট হলে বাড়ত না ওভাবে। ওসব হল উদ্ভিদ—"

"উদ্ভিদ? উদ্ভিদই কি অত তাড়াতাড়ি বাড়ে না কি?" ক্ষেপে ওঠে জেরি।

"বাড়ে না, তবে নড়ে। নড়তে নড়তে ছড়িয়ে পড়ে। আইভি-লতাকে নড়তে গড়তে ছড়িয়ে পড়তে দেখনি পৃথিবীতে? সমুদ্রে একজাতীয় ক্ষুদে উদ্ভিদ আছে—প্ল্যাঙ্কটন, জানো অবশ্য। তাদের দেখনি সাঁতার দিতে? কালো কার্পেট বলে যাকে ভুল করছ, তাই হল শুক্রগ্রহের প্রথম উদ্ভিদ, জীবনের প্রথম স্ফুরণ এই নিষ্প্রাণ গ্রহে।"

জেরির দিকে আর না তাকিয়ে সেই কার্পেটাকারের কালো উদ্ভিদ পুঞ্জের দিকে দুই বাহু বাড়িয়ে ছুটে গেলেন হাকিন্স। তাঁর আনন্দের কি সীমা আছে আজ? তিনি আবিষ্কার করেছেন যে, শুক্রে জলও আছে, জীবনও আছে। হোক সে-জীবন একান্ত আদিম স্তরের, তবু তারই দৌলতে শুক্রের বন্ধ্যা অপবাদ আজ ঘুচে গেল। জীবধাত্রী বলে পৃথিবী আর মঙ্গলের সমপর্যায়ে সে উন্নত হল?

সূর্যের চাঁদ

ষোড়শ শতাব্দীর পোলাণ্ডবাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপার্নিকাস মরণকালে আক্ষেপ করেছিলেন—"বুধ গ্রহটাকে জীবনে দেখলাম না কোনদিন।"

শুধু কোপার্নিকাস কেন, অনেকেই দেখেন নি বুধকে। সূর্যের নিকটতম গ্রহ এটি, সূর্যের প্রচণ্ড দীপ্তির ভিতর কোথায় যে এ লুকিয়ে থাকে, পৃথিবী থেকে মানুষের চোখ তা ধরতে পারে না প্রায়ই।

বস্তুতঃ বুধকে দেখতে পাওয়া যেতে পারে, সন্ধ্যাবেলায় বা ভোরবেলায় খুব অল্পক্ষণের জন্য। সূর্য যখন চক্রবাল রেখার ঠিক নীচে। তখন সূর্যালোকের কোন দীপ্তি থাকে না, কাজেই বুধকে খোলা চোখে দেখতে পাওয়া যায়। বসন্ত-কালে একেই আমরা বলি সন্ধ্যাতারা, আবার শুকতারাও একেই বলি হেমন্ত।

তারা? হ্যাঁ, গ্রহ হলেও বুধের আলো তারার মতই মৃদু। আয়তনে পৃথিবীর চাঁদের চাইতে বিশেষ বড় নয়, থাকেও সূর্যের গায়ে গায়ে। এজন্য রহস্য করে অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী একে বলেন সূর্যের চাঁদ।

কথা কেনা

শ্রীবরুণকুমার চক্রবর্তী

এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণের সংসারে ছিল তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূ। ব্রাহ্মণের বড় ইচ্ছা একমাত্র ছেলেকে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত করে তুলবেন। কিন্তু ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে হলে অর্থের প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ গ্রামের জমিদারের কাছ থেকে শ' চারেক টাকা সাহায্য বাবদ নিয়ে এসে ছেলেকে দিলেন। শুভদিন দেখে ছেলে বিদ্যার্জনের জন্য যাত্রা করলে।

পথে যেতে যেতে ব্রাহ্মণপুত্রের সঙ্গে এক বৃদ্ধের দেখা হল। বৃদ্ধ বললে, 'আমার তিনটি কথা আছে এবং প্রতিটির মূল্য একশত টাকা।'

ব্রাহ্মণপুত্র বৃদ্ধের কাছ থেকে প্রথমে একটি কথা জানতে চাইলে। বৃদ্ধ একশ' টাকা অগ্রিম নিয়ে বললে, 'যখন যেমন, তখন তেমন।' প্রথম কথাটি শোনার পর ব্রাহ্মণপুত্র বৃদ্ধের কাছে দ্বিতীয় কথাটি শুনতে চাইলে। এবারেও বৃদ্ধকে অগ্রিম একশ' টাকা দিতে হল। বৃদ্ধ দ্বিতীয় যে কথাটি বললেন সেটি হল, 'জাগলেই তো তরি।' ব্রাহ্মণপুত্রের তখন বৃদ্ধের তৃতীয় কথাটি শোনার জন্যে প্রবল আগ্রহ হয়েছে। তাই আরও একশ' টাকা দিয়ে ব্রাহ্মণ-পুত্র বৃদ্ধের তৃতীয় কথাটিও শুনে নিলে—'নির্ধনের মেয়ে হলেই কড়ির বশে ফিরি।'

ব্রাহ্মণপুত্রের প্রায় সব টাকা শেষ হয়ে গিয়েছিল। অগত্যা চিন্তামগ্ন চিত্তে তৃতীয় দিবসে সে বাড়ি ফিরলে। তখন বিকালবেলা। ব্রাহ্মণ গ্রামের মুদিখানায় বসেছিলেন। ছেলে ফিরে এসেছে শুনে বাড়ি ফিরলেন। ব্রাহ্মণ যখন ছেলের কাছে তার কথা শোনার জন্যে সব টাকা খরচ হয়ে যাওয়ার ব্যাপার শুনলেন, তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ছেলেকে ত্যাজ্য পুত্র করলেন।

ছেলে সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু স্ত্রী ও পুত্রবধূর অনুরোধে ব্রাহ্মণ সেদিন

রাত্রিটা ছেলেকে বাড়িতে থাকতে দিলেন। রাত্রিবেলা পুত্র তার স্ত্রীকে উপদেশ দিলে, 'আমি না ফেরা পর্যন্ত বৃদ্ধ মা-বাবার সেবা করবে।'

পরদিন সকাল হতেই পুত্র বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

দিন যায়। একদিন ব্রাহ্মণপুত্র যখন একটি গ্রামের মধ্য দিয়ে চলেছে, পথিমধ্যে এক বৃদ্ধ তাকে তার পরিচয়, বাসস্থান প্রভৃতির কথা জিজ্ঞাসা করলে। তাকে ব্রাহ্মণসন্তান জেনে বৃদ্ধটি তাকে নিয়ে হাজির হল গ্রামের বটতলায়। বটতলায় গ্রামের মাতব্বর ধরনের অনেকে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সকলে ব্রাহ্মণপুত্রকে চেপে ধরলে, 'আমাদের একটা উপকার করতে হবে। গ্রামের মহারাজ (সাধু) তিনদিন হল দেহরক্ষা করেছেন। তাই গ্রামের বিষ্ণু ও শিবপূজা হয়নি। ঠাকুরের নিত্যপূজা হয়নি বলে গ্রামের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সকলেই গত তিন দিন ধরে উপবাসী রয়েছে। অতএব আপনি বিষ্ণু ও শিব পূজা করে গ্রামে বয়স্কদের প্রাণ রক্ষা করুন।'

ব্রাহ্মণপুত্র পূজা করতে সম্মত হল। তারপর স্নান সেরে ফুল, তুলসীপাতা প্রভৃতি পূজার উপকরণ সংগ্রহ করে নিয়ে ঠাকুর মন্দিরে গিয়ে ঠাকুর পূজা করলে। ঠাকুর পূজা হবার পর গ্রামের উপবাসী বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা তাদের উপবাস ভাঙ্গলে। যে বৃদ্ধের সঙ্গে ব্রাহ্মণপুত্র গ্রামের বটতলায় এসে হাজির হয়েছিল, তার বাড়িতে সে বিশ্রাম ও জলগ্রহণ করলে। এরপর গ্রামের লোকেরা তাকে ধরে বসলে পরলোকগত মহারাজের পারলৌকিক কর্ম সম্পাদনের জন্যে। ব্রাহ্মণপুত্র এতেও রাজী হল। মহারাজের মৃতদেহ মাথায় নিয়ে সে চলেছে দাহ করতে। যাবার সময় সারাটাক্ষণ সাধুর কোমরে বাঁধা মোটা একটা দড়া থেকে ঝন-ঝন শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ব্রাহ্মণপুত্রের বড় কৌতূহল হল। সে ভাবলে, দাহ করার সময় দেখতে হবে কেন শব্দ হচ্ছিল।

গঙ্গার পাড়ে চিতায় মহারাজের দেহটা চাপিয়ে সে গ্রামের লোকেদের বললে, 'আমি মুখাগ্নি করব না। কেননা সাধু আমার আত্মীয় বা সগোত্র কেউ নয়।'

এমনিই আগুন লাগান হল। তার আগে ব্রাহ্মণপুত্র সাধুর কোমরের দড়া থেকে দশটা মোহর ও একটা মানিক পেলে। দাহ শেষ হলে সাধুর অস্থি গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে গ্রামের লোকজন সহ ব্রাহ্মণপুত্র গঙ্গাস্নান করে গ্রামে ফিরে এল। পরদিন সে গ্রাম থেকে চলে যেতে চাইলে গ্রামবাসীরা রাজী হল না। তারা ব্রাহ্মণ-পুত্রকে অনুরোধ করলে সাধুর শ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণ ভোজন না হওয়া পর্যন্ত তাদের গ্রামে থাকতে। গ্রামের পুরোহিত দশ দিনের দিন এলে এবার সাধুর ব্রাহ্মণ ভোজন ইত্যাদি চুকিয়ে ছেলে গ্রাম ত্যাগ করলে। যাবার সময় গ্রামবাসীরা তাকে এক জোড়া কাপড়, জামা ইত্যাদি এবং বেশ কিছু টাকা দিলে। ব্রাহ্মণপুত্র মনে মনে ভাবলে, 'যখন যেমন, তখন তেমন' কথাটা পূর্ণ হয়েছে। দেখা যাক, এখনও দুটো কথা বাকী রয়েছে।

আবার তার যাত্রা শুরু হল। বেশ কিছুদূর যাবার পর ক্লান্ত হয়ে পথে একটা বৃহৎ সরোবর দেখে ব্রাহ্মণপুত্র সেই সরোবরের জলে নামলে স্নান করতে। সরোবর থেকে সবে স্নান সেরে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে একটা হাতি শুঁড়ে করে তাকে পিঠে বসিয়ে নিলে। তারপর তাকে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দিল এক রাজসিংহাসনে। মন্ত্রী, দেওয়ান সব রাজকর্মীরা এসে হাজির। ছেলের ব্রাহ্মণত্বের বদলে বেশ রাজার ভাব এল। প্রয়োজনীয় রাজ-কর্মে সারাটা সকাল তার কেটে গেল। বেলায় মহল থেকে তার ডাক এল। মহলে যেতেই রানী

ব্রাহ্মণপুত্রকে বসিয়ে স্বর্ণভৃঙ্গারের জল দিয়ে পা ধুয়ে দিলে। তারপর নিজের মাথার চুল দিয়ে তার পা মুছিয়ে দিলে। এরপর জলযোগের ব্যবস্থা হল। স্বর্ণপাত্রে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হল। জলযোগ সেরে ব্রাহ্মণপুত্র পুনরায় রাজ-দরবারে এসে বসলে, রাজকার্য সম্পাদনের জন্যে। বেলা দ্বিপ্রহরে সকল রাজকার্য সেরে ব্রাহ্মণপুত্র আবার রাজঅন্তঃপুরে ফিরে গেল। স্নান সেরে আহারাদি করে বিশ্রামাগারে গেল তারপর বিশ্রাম করতে। বেলা পড়ে গেলে বিশ্রাম সেরে সে আবার রাজকার্যে আত্মনিয়োগ করলে। সন্ধ্যার সময় রাজকার্য থেকে তার অব্যাহতি মিলল। অন্দরে বসে সন্ধ্যাবেলা ব্রাহ্মণপুত্র ভাবতে লাগল, 'আমি যে রাজা হলুম, এর কারণ কি?' সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল, 'জাগলেই তো তরি'!

রাত্রে ব্রাহ্মণপুত্র জেগে থাকবে বলে ঠিক করলে। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে শয়নাগারে গিয়ে দেখলে ঘরের চারিটি কোণে ঢাল ও তলোয়ার টাঙ্গান রয়েছে। পালঙ্কে শুয়ে সে ঘুমের ভান করে পড়ে রইল। কিছু পরে রানীও এসে উপস্থিত। রানী পালঙ্কে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার পর ব্রাহ্মণপুত্র একটি ঢাল ও তলোয়ার ঘরের এক কোণ থেকে এনে নিজের হাতের কাছে রেখে দিলে। গভীর রাত্রে দেখা গেল রানীর নাক থেকে সুতোর মত সরু একটা সাপ বেরিয়ে ক্রমে ক্রমে সেটা বেশ মোটা হল। কিন্তু ছোবল মারার আগেই ব্রাহ্মণপুত্র তলোয়ার দিয়ে সাপটিকে কেটে ফেললে। পরদিন অনেক বেলায় রানী ঘুম থেকে উঠল। এদিকে সকালে ব্রাহ্মণপুত্রকে জীবিত অবস্থায় দেখে মন্ত্রী, কোটাল, দেওয়ান সকলে খুব অবাক্। ওদিকে হাতিশালে রাজহস্তী তখন খুব চিৎকার করছে। তাকে খুলে দিতেই সে এসে রাজাকে শুঁড় তুলে আশীর্বাদ করলে। ব্রাহ্মণপুত্র বেলায় রাজঅন্তঃপুরে ফিরে

একটা হাতি শুঁড়ে করে তাকে তুলে নিল। [পৃষ্ঠা ১৯২

গেল। এইভাবে কিছুদিন কাটার পর তার বাবা, মা, স্ত্রী সকলের কথা মনে পড়ল। রানীকে সে এদের কথা সব বললে। তারপর রানীর পরামর্শ-মত হাতি, ঘোড়া, উট, রসদ, মন্ত্রী, দেওয়ান প্রভৃতিদের নিয়ে সে যাত্রা করলে। দিন কয়েক বাদে সে নিজের গ্রামে এসে উপস্থিত। গ্রামের লোকেরা কিন্তু কেউ ব্রাহ্মণপুত্রকে চিনতে পারলে না। ব্রাহ্মণপুত্র দিন পনের গ্রামে থাকলে। একদিন সে এক ব্রাহ্মণ আনার কথা বললে। গ্রামের লোকেরা তারই পিতাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করলে। পুত্রকে ব্রাহ্মণ চিনতে পারলেন না। পুত্র কিন্তু ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে শশব্যস্তে বসার উপযুক্ত আসন দিলে। খাওয়ার সময় হলে পুত্র নিজের ডানপাশে ব্রাহ্মণকে বসালে।

ব্রাহ্মণ উৎসর্গ করে কিছু প্রসাদ দিলে তবেই সে খাওয়া আরম্ভ করলে।

পুত্র ব্রাহ্মণের কাছে নিজ পরিচয় গোপন রেখে, তার বাড়ির সব খবর নিয়ে ব্রাহ্মণী অর্থাৎ তার নিজের মাকে পরদিন সঙ্গে করে নিয়ে আসতে বললে। পুত্র বললে যে ব্রাহ্মণের দক্ষিণা দেবে আট টাকা আর ব্রাহ্মণীর দক্ষিণা দেবে ষোল টাকা।

ব্রাহ্মণ সত্য সত্যই পরদিন ব্রাহ্মণীকে নিয়ে গিয়ে হাজির হলেন। মাকে আসতে দেখে শশব্যস্তে এগিয়ে গিয়ে সে তাকে প্রণাম করলে। ব্রাহ্মণীও রাজবেশী পুত্রকে আশীর্বাদ করলেন। মন্ত্রীকে দিয়ে ব্রাহ্মণপুত্র শাঁখা শাড়ি আনিয়ে মাকে দিলে। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে টাকা নিয়ে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বিদায় নিলেন। পরদিন ব্রাহ্মণপুত্র ব্রাহ্মণকে তাঁর পুত্রবধূকে আনার জন্য বলে দিলে। দক্ষিণা বত্রিশ টাকা দেবে বলেও বললে। পরদিন পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে ব্রাহ্মণ উপস্থিত হলেন। পুত্রবধূর পরনে ছেঁড়া কাপড় দেখে ব্রাহ্মণপুত্র তাকে ভাল শাড়ি আনিয়ে দিলে। প্রত্যহই ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী ও তাদের পুত্রবধূ আসে, খায় দায় আর টাকা নিয়ে চলে যায়। প্রত্যহ বত্রিশটা করে টাকা পেয়ে পুত্রবধূর বেশ লোভ হয়ে গেল। ব্রাহ্মণ-পুত্রের নিজ রাজ্যে ফেরার সময় এগিয়ে এলে শেষে সে বৃদ্ধ শ্বশুরকে দিয়ে রাজবাড়ির কোন কাজে তাকে লাগাবার প্রস্তাব করালে। ব্রাহ্মণ-পুত্র মনে মনে হেসে বললে, এতদিনে তৃতীয় কথাটাও ফলে গেল। 'নির্ধনের মেয়ে হলেই কড়ির বশে ফিরি'।

নিজরাজ্যে ফিরে যাওয়ার যখন তিনদিন আর বাকী, তখন ব্রাহ্মণের পুত্র গ্রামের যত পাঠশালার পড়ুয়াদের একদিন পেট ভরে খাওয়ালে। পরদিন খাওয়ালে গ্রামের যুবকদের এবং শেষ দিন গ্রামের মুরুব্বিদের ভোজে আপ্যায়িত করলে। গ্রামের লোক তো ব্রাহ্মণপুত্রের ধন্যি ধন্যি করতে লাগল। যাবার আগের দিন ব্রাহ্মণপুত্র তার বাবা, মা ও পত্নীকে আনিয়ে সকলের সামনে নিজের পরিচয় দিলে। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ও নিজের পত্নী সকলেই তখন আনন্দে আত্মহারা। অতঃপর গ্রামের সকলের অনুমতি নিয়ে মা, বাবা ও পত্নীকে নিয়ে সে নিজের রাজ্যে ফিরে গেল।

———

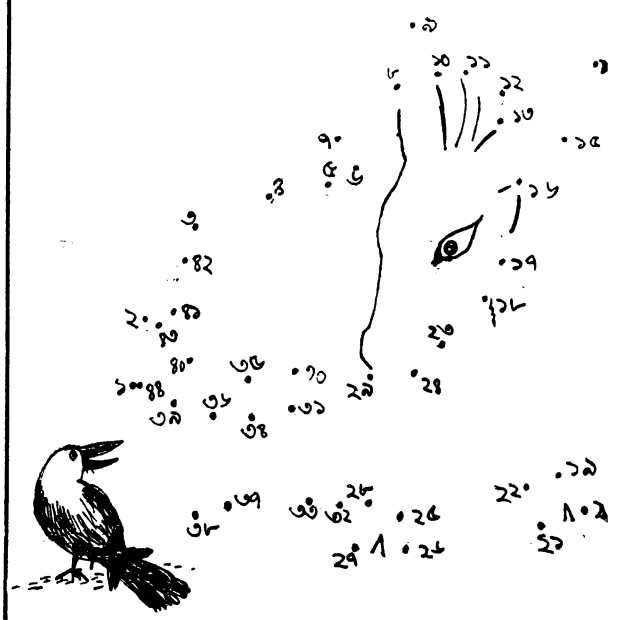

বল তো কাকটা কি দেখছে? না পারলে ১ থেকে ৪৪ পর্যন্ত দাগ টানো।

রবটকুমার

নারায়ণ চক্রবর্তী

সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে সে এক দেশ, নাম আজব দেশ। সে দেশে রাজা নেই, কিন্তু আছেন এক রাষ্ট্রপতি। তবে মন্ত্রী, কোটাল, সওদাগর, যন্ত্রবিদ্, পাত্র-মিত্র, সৈন্য-সামন্ত, এঁরা সবাই আছেন।

এক শীতের দুপুরে আজব দেশের সভা আলো করে বসে আছেন রাষ্ট্রপতি। মন্ত্রী, কোটাল, যন্ত্রবিদ, পাত্রমিত্র, সভাসদগণ যথাযোগ্য আসনে বসে আছেন। রাজকার্যের জন্য গুরুতর মন্ত্রণা চলছিল সেখানে।

হঠাৎ ঘরের বাইরে ধুপধাপ আওয়াজ হল। সবাই উৎকর্ণ হয়ে দরজার দিকে তাকালেন। ঘড়াং শব্দে দরজা খুলে গেল, হাঁপাতে হাঁপাতে গোয়েন্দাকুমার সভায় এসে ঢুকল দমকা হাওয়ার মতো।

সভার সবাই অবাক্ হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল। গোয়েন্দাকুমারের বাদামী মুখ সিঁদুরে রঙ্ ধরেছিল, নিশ্বাসে যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। চুল উসকো খুসকো, পরনের টেরিকটন প্যান্ট শার্ট কুঁচকে গেছে, কোমরের বেল্ট খসে পড়েছে, পায়ের জুতো জোড়াও ধূলিধূসরিত।

প্রাথমিক বিস্ময় কেটে যাবার পর পাত্র পাত্রনবিশ বলল,—"একি কাণ্ড গোয়েন্দাকুমার? সদাসর্বদা ফিটফাট থাকবার জন্য তোমার বেশ নামডাক আছে। রাষ্ট্রসভায় আসবার সময়ে কোথায় আরও ধোপ দুরুস্ত হয়ে আসবে, তার বদলে এ কী?"

কড়া চোখে একবার পাত্রনবিশের মুখের দিকে তাকাল গোয়েন্দাকুমার। সবার সব খবরই রাখে সে। জানে যে লোকটা মহা ধুরন্ধর। কালো টাকার কারবারী। কিন্তু বিচ্ছুটি বলবার উপায় নেই। সে আবার মন্ত্রীমশায়ের পিসতুতো ভাইয়ের ভাগ্নী-জামাইর জ্যাঠতুতো শালা! মনের রাগটুকু গিলে ফেলে বলল,—"কি জানেন পাত্রমশাই, অজ্ঞান যে হয়ে যাইনি এই আমার বাপের ভাগ্যি। আপনি হলে পত্রপাঠ অক্কা পেতেন।"

মিত্র মঞ্জুর হোসেন বলল,—"কিন্তু সারা দেশ ঘুরে ঘুরে গোয়েন্দাগিরি করবার জন্য তোমাকে তো দেশের সেরা মোটরগাড়ি দেওয়া হয়েছে, তা সত্ত্বেও এমন মায়ে খেদানো, বাপে তাড়ানো দশা কেন তোমার?"

সওদাগর বজরঙ্গবলী খৈতান বলল,—"তোবে কি পেটরওল মে ভেজাল ছিলো গোয়েন্দাকুমার? ওহি ওয়াস্তে গাড়ি খরাব হোয়ে গেলো কি? কওন পেটরওল পাম্প থেকে কিনেছিলে হামকো একবার দেখাও তো,—খাশ কোরে তোমাকে ভেজাল তেল বিক্রি কোরতে হামি মনা কোরে দিয়েছি সোব্বাইকে, হ্যাঁ।"

টাকার কাছে সবার মাথাই নত হয়। গোয়েন্দা-কুমার বিনীতভাবে বলল,—"না না, সে সব কিছু নয়।"

মন্ত্রী মন্ত্রণাময় এতক্ষণ সব শুনছিল, এবারে বলল,—"ব্যাপারটা একটু খুলেই বলো গোয়েন্দা-কুমার, রাষ্ট্রপতির কাছে নিবেদন করো সমাচার।"

এবারে সোজা হয়ে দাঁড়াল গোয়েন্দাকুমার। ততক্ষণে বেশ কিছুটা সামলে নিয়েছে সে। বলল, —"মন্ত্রীমশাই, এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম আজ।"

কোটাল বলল,—"অদ্ভুত দৃশ্য? তার মানে?"

"অদ্ভুতও বলা যায়, আবার অসাধারণও বলা যায় তাকে।"

মৃদু ধমক দিয়ে মন্ত্রীমশাই বললেন,—"হেঁয়ালী ছাড়ো, খুলে বলো কথাটা।"

ধমক খেয়ে ধাতস্থ হল গোয়েন্দাকুমার। বলল, —"মন্ত্রীমশাই, চোর ডাকাত বদমাশ সবার ওপর নজর রাখবার জন্য নগরের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে হয় আমাকে। আজ সকালে গিয়েছিলাম শহরের বাইরে খামার অঞ্চলে। ধরায় ওখানে লোকদের অশেষ দুর্গতি। সরকারী নলকূপ দিয়ে শুধু বালি উঠছে। আপনার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা এই সুযোগে লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলছে। এই সব দেখে শুনে তেপান্তরের মাঠের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরছি, এমন সময়ে অনাবৃষ্টির আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলাম—"

"কি দেখলে? কি দেখলে?" সমস্বরে বলে উঠল সব সভাসদ।

"দেখলাম একটা উড়ন্ত চাকতি—"

"উড়ন্ত চাকতি! সে কি?" বলে উঠল যন্ত্রবিদ্ যন্ত্রণাময়।

"হ্যাঁ যন্ত্রবিদ্‌মশাই, একটা উড়ন্ত চাকতি। স্বচক্ষে দেখলাম হুশ করে নেমে পড়ল তেপান্তরের মাঠে, রাক্ষুসে বটগাছের কাছে।"

"তারপর? তারপর?"

"নামবার সময়ে চারদিক আলো হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল যে, দ্বিতীয় সূর্য যেন নেমে আসছে!"

মাথা নেড়ে যন্ত্রবিদ্ বলল,—"তা তো হবেই, তা তো হবেই। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে ঘর্ষণ হয়েছে কিনা, তাই অতিশয় তপ্ত হয়েছে চাকতিটার বহিরাবরণ!"

"তা হতে পারে, আমি কিন্তু অত শত বিচার বিবেচনার জন্য আর দাঁড়াইনি সেখানে, খবর দিতে সোজা ছুটে এসেছি রাষ্ট্রসভায়।"

কোটাল বলল,—"খুব ভালো করেছ। মন্ত্রণা-সভার অধিবেশন চলছে। ইতিকর্তব্য নির্ধারণ হয়ে যাবে এখনই।"

সবাই চিন্তামগ্ন হয়ে গেল। এত বড় সভায় টুঁ শব্দটি রইল না। রাষ্ট্রপতি চিরকাল যেমন চুপ করে থাকেন তেমনি চুপ করে রইলেন।

মন্ত্রীমশাই ভেবে চিন্তে বলল,—"এ বড় দুঃসংবাদ গোয়েন্দাকুমার!"

"দুঃসংবাদ?"

"হ্যাঁ। ঐ চাকতির ভেতরে ভিন্ গ্রহের যুদ্ধ-সেনাও থাকতে পারে। হয়তো তাদের কাছে এমন সব অতি উন্নত ধরনের অস্ত্র-শস্ত্র আছে যার কাছে আমাদের পারমাণবিক বোমাও তুচ্ছ?"

কোটাল বলল,—"ঠিক কথা মন্ত্রীমশাই, ইতিহাস বলে যে, এই ভাবেই বার বার বিদেশী শত্রুর উন্নত ধরনের অস্ত্র-শস্ত্রের কাছে আমাদের শৌর্যবীর্য সব ব্যর্থ হয়ে গেছে। সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হবে নাকি আবার? এখন আমাদের করণীয় কি? সেনাপতি কি বলেন?"

গভীর চিন্তার ভারে সভাসদদের মাথা বুকের কাছে নুয়ে এলো, সবাই নীরব নিশ্চল, কারুর কারুর তন্দ্রাবেশ হল। প্রকাণ্ড মন্ত্রণাসভা থমথম করতে লাগল।

রাষ্ট্রপতি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। বলে উঠলেন,—"দেশের এই সংকট মুহূর্তে প্রজা-সাধারণের কাছে আমি কি বাণী বিতরণ করব মন্ত্রী?"

মন্ত্রীমশাইয়ের মাথাটা ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠে আসতে লাগল। চোখ খুলে তাকাল সে। বলল,—"হ্যাঁ, ঠিক কথা। রাষ্ট্রপতির বাণীর বয়ান তো আমাকেই প্রস্তুত করতে হবে। তবে বয়ানটা কী ধরনের হবে তাই ভেবে পাচ্ছি না। ওদিকে এতক্ষণে হয়তো উড়ন্ত চাকতি থেকে ভিন্ গ্রহের

সৈন্য-সামন্ত সবাই নেমে পড়েছে তেপান্তরের মাঠে। সেখান থেকে রাজধানী মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ।"

যন্ত্রীমশাই বলল,—"হয়তো ওরা এতক্ষণে রাজধানীর উপকণ্ঠে পৌঁছে গেছে।"

লাফিয়ে উঠে সেনাপতি বলল,—"আমি একটা বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে এগিয়ে গিয়ে ওদের মোকাবিলা করব মন্ত্রীমশাই? ট্যাঙ্ক বাহিনী দিয়ে উড়ন্ত চাকতিটাকে ঘিরে রাখলে কেমন হয়? একটা মাত্র চাকতির ভেতরে আর কত সৈন্য থাকতে পারে? ওদের কাবু করে ফেলতে মোটেই দেরি হবে না।"

মাথা নেড়ে মন্ত্রীমশাই বলল,—"কিন্তু একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ সেনাপতি। এ যুগে লোকবল কোনো বলই নয়, যন্ত্রবলই সবচেয়ে বড় বল, যন্ত্র-শক্তিই শ্রেষ্ঠ শক্তি। একটি মাত্র পারমাণবিক বোমা লক্ষ লোকের প্রাণ নিতে পারে। তা ছাড়া ভিন্ গ্রহের মানুষেরা আগে থেকেই আমাদের যুদ্ধং দেহি ভাব দেখলে মেজাজ খারাপ করেও ফেলতে পারে। এমনও তো হতে পারে যে, ওদের মনে কোনো খারাপ মতলব নেই।"

—"ঠিক বাৎ, ঠিক বাৎ, ওরা তো হামাদের সঙ্গে বেওসা-বাণিজ্য কোরতেও আসতে পারে?"

সওদাগর বজরঙ্গবলী তার মোটা ঘাড় দুলিয়ে বলে উঠল,—"ঠিক বাৎ, ঠিক বাৎ, ওরা তো হামাদের সোঙ্গে বেওসা-বাণিজ্য কোরতেও আসতে পারে? আগেই ভড়কে দিলে ঠিক হোবে না। দুসরা গ্রোহে সোনা—চাঁদি—প্ল্যাটিনাম বহোত পাওয়া যায়, হামি আখবারে পড়েছি, হাঁ।"

পাত্র পাত্রনবিশ বলল,—"হ্যাঃ ব্যবসা করবে না হাতি। যদি ওরা মঙ্গলগ্রহের প্রাণী হয় তাহলে নির্ঘাৎ জল নিতে এসেছে পৃথিবী থেকে। শুনেছি মঙ্গলগ্রহে জলের খুব অভাব। হাজার ক্রোশী খাল কেটেও সে অভাব মিটছে না।"

মিত্র মঞ্জুর-হোসেন পাকা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল,—"আহা, আগেভাগেই খারাপটা ভাবছ কেন তোমরা? হয়তো ওরা আমাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করতে এসেছে, হয়তো আন্তগ্রহ সহাবস্থান নীতিতে বিশ্বাসী ওরা। ওকি! ও কিসের শব্দ?"

হঠাৎ প্রধান তোরণের দিক থেকে বিরাট শোরগোলের শব্দ ভেসে এল। সবাই কথা থামিয়ে উদ্‌গ্রীবভাবে সেদিকে তাকালো। একজন প্রহরী ছুটে এল, রাষ্ট্রপতিকে অভিবাদন জানিয়ে

মন্ত্রীমশায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল,—"মন্ত্রী-মশাই, মহা বিপদ—"

আঁতকে উঠে মন্ত্রী বলল,—"বিপদ? কিসের বিপদ?"

"একটা অজানা, অচেনা কিম্ভূত লোক প্রধান তোরণে এসে ভেতরে ঢুকতে চাইছে?"

"কিম্ভূত লোক? তার মানে? কি রকম দেখতে?"

"হাত পা শরীর সব মানুষেরই মতো, তবু সব মিলিয়ে কী রকম যেন।"

মন্ত্রী তখন গোয়েন্দাকুমারের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল,—"এই বোধ হয় উড়ন্ত চাকতির মানুষ, ভিন্ গ্রহ থেকে এসেছে। একবার যাও তো, দেখে এস তো ব্যাপারটা।"

প্রহরীর সঙ্গে চলে গেল গোয়েন্দাকুমার। ফিরে এল কয়েক মিনিটের মধ্যেই, সঙ্গে একটি কিম্ভূত লোক। সভার সবাই অবাক্ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটিকে তারা সিংহের মামা ভোম্বলদাসই বলবে, না রাক্ষসের ভাই খোক্কশই বলবে, তা ভেবে ঠিক করতে পারল না।

কিম্ভূত বললেই সবটুকু বলা হয় না। লোকটির মাথাটা প্রকাণ্ড, সাধারণ মানুষের প্রায় ডবল হবে। চোখ দুটো রাজভোগের মতো গোল। নাকটা টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো বাঁকানো আর টুকটুকে লাল। মসৃণ চকচকে টাক-মাথা থেকে তিনটি দণ্ড খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু কাঁপছিল। গায়ের রং গাঢ় নীল। লোকটির পরনে ছিল উজ্জ্বল এক ধরনের পোশাক, যা থেকে আলো ফুটে বার হচ্ছিল।

হাত দুটো আকাশের দিকে তুলে সভার সবাইকে অভিবাদন জানাল লোকটি, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল, একটি কথাও বলল না।

মন্ত্রীমশাই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে গোয়েন্দাকুমারের মুখের দিকে তাকাল, কাঁচুমাচুভাবে গোয়েন্দাকুমার বলল,—"মন্ত্রীমশাই, দেখে শুনে মনে হচ্ছে যে ইনিই উড়ন্ত চাকতিতে করে পৃথিবীতে এসেছেন।"

চর্মচক্ষে উড়ন্ত চাকতির লোক দেখতে পাবে এ কল্পনাও করেনি কেউ, তাই স্তব্ধ-বিস্ময়ে আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সবাই। শেষটায় নীরবতা ভঙ্গ করে মন্ত্রীমশাই বলল,—"ইনি কি একাই এসেছেন নাকি?"

"না, সঙ্গে আরও কয়েকজন আছেন। অবিকল একই রকম দেখতে, চেহারা দেখে আলাদা বলে চিনবার উপায় নেই।"

"তারা সব কোথায়?"

"প্রধান তোরণের পাশে অভ্যর্থনা কক্ষে অপেক্ষা করছে। ইনি এসেছেন সবার প্রতিনিধি হয়ে।"

মন্ত্রীমশাই আর একবার আগন্তুকের ভাবলেশ-হীন মুখের দিকে তাকাল,—লক্ষ্য করল যে, তার মাথার মাঝখানের দাঁড়াটা অল্প অল্প কাঁপছে বিনা বাতাসেই। একটু ইতস্ততঃ করে বলল,—"আগন্তুক, তুমি কি চাও?"

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইল আগন্তুক, তারপর বলল,—"আপনি কে?"

কেমন যেন খোনা খোনা যান্ত্রিক আওয়াজ। কথাতেও বিদেশী টান। তবু বেশ স্পষ্ট, পরিষ্কার নির্ভুল-উচ্চারণ, বুঝতে বিন্দুমাত্রও অসুবিধা হয় না। মন্ত্রীমশাই জবাব দিল,—"আমি এই আজব দেশের মন্ত্রী, উনি রাষ্ট্রপতি, এঁরা পাত্রমিত্র, কিন্তু তুমি কে?"

"আমি মঙ্গলগ্রহের রাজপুত্র—রবটকুমার।"

রবটকুমার? এ আবার কোন্ দিশী নাম রে বাবা? তবে লোকটার চেহারাই যখন কিম্ভূত তখন আর নামটাই বা অদ্ভুত হবে না কেন?

নিজেকে সামলে নিয়ে মন্ত্রীমশাই বলল,—

"কিন্তু তুমি মঙ্গলগ্রহের লোক হয়ে আজব দেশের বাংলা ভাষা শিখলে কি করে রবটকুমার ?"

"আগে জানতাম না, একটু আগেই শিখে নিয়েছি।"

"একটু আগে ? ভড়কে গিয়ে মন্ত্রীমশাই বলল, "তার মানে ? কি করে ? কোথায় ?"

"এখানেই, আপনার সামনে দাঁড়িয়ে।"

'কিম্ভূত লোকটা কি ঠাট্টা করছে আমার সঙ্গে ?' মনে মনে ভাবল মন্ত্রীমশাই, ভেতরে ভেতরে গরমও হল। বলল,—"কি রকম ? তা কি করে সম্ভব ?"

"এই যে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন আপনারা, তা থেকেই ভাষার মূল ধরে ফেলেছি আমি। ঐ মূল থেকেই কথার সৃষ্টি করেছি। খুবই সহজ ব্যাপার। এখনও একটু আধটু আড়ষ্ট লাগছে বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সেটুকুও কেটে যাবে, আরও স্বচ্ছন্দ ভাবে বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারব।"

রবটকুমারের কথা শুনে থ' মেরে গেল সবাই। লোকটা বলে কি ? কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাংলার মতো একটা কঠিন জটিল ভাষাকে আয়ত্ত করে ফেলেছে মঙ্গলগ্রহের এই রাজপুত্র !

ওদের সেই বিমূঢ় ভাব দেখে একটু হেসে রবটকুমার বলল,—"এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই মন্ত্রীমশাই। জ্ঞানে বিজ্ঞানে, মস্তিষ্কের ইলেকট্রনিক গঠনে আমরা, মঙ্গলগ্রহীরা পৃথিবীর মানুষের চেয়ে কয়েক হাজার বছর এগিয়ে আছি।"

আর অবাক্ হওয়া নিষ্ফল জেনে মন্ত্রীমশাই বলল,—"তা মঙ্গলগ্রহ ছেড়ে উড়ন্ত চাকতিতে চেপে পৃথিবীতে এসেছ কেন রবটকুমার ?"

"এখানে এসেছি কেশবতী রাজকন্যার সন্ধানে।"

"সে কি ! সে আবার কে ?"

"দুধসাগরের তীরে তার প্রাসাদ। কুঁচবরণ এই কেশবতী রাজকন্যার মেঘের মতো চুল। সে হাসলে মানিক ঝরে, কাঁদলে মুক্তা ঝরে। তাকে খুঁজে বার করবার জন্যই মঙ্গলগ্রহের কোটাল-পুত্র, বণিকপুত্র, আর মন্ত্রীপুত্রকে নিয়ে আমার নিজস্ব উড়ন্ত চাকতিতে চেপে গ্রহান্তরে পাড়ি দিয়েছি আমি। সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে এই আজব দেশে এসে রাক্ষুসে বটগাছের ধারে নেমেছি। সেই কেশবতী রাজকন্যা কোথায় আছে বলুন, আমি তাকে পক্ষিরাজ ঘোড়ার বদলে উড়ন্ত চাকতিতে চাপিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাব আমার দেশে।"

রবটকুমারের আবেগে কাঁপা কথা শুনে পাত্র-মিত্র সভাসদরা হাসবে কি কাঁদবে তা ভেবে পেল না। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত বিমূঢ় হয়ে গেলেন।

রবটকুমার আবার বলল,—"আমার সঙ্গে চালাকি করতে যাবেন না। রূপকথার রাজপুত্রের মতোই আমি অসমসাহসী বীর। আমার তলোয়ার নেই বটে, কিন্তু সঙ্গে আছে সর্বধ্বংসী রশ্মি, যা দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে আপনাদের সুবিশাল নগরী ধ্বংস করে ফেলতে পারি। তাড়াতাড়ি বলুন, কোথায় কোন্ প্রাসাদে রুপোর কাঠি ছুঁইয়ে অজ্ঞান করে রেখেছেন সেই কেশবতী রাজকন্যাকে।"

রবটকুমারের বোলচাল আর সহ্য হল না সেনাপতিমশায়ের, হাজার হোক, সৈনিক পুরুষ তো ! বলে উঠল,—"সর্ব-ধ্বংসী রশ্মির ভয় দেখাবেন না রবটকুমার। জানেন আমাদেরও আছে হাইড্রোজেন বোমা, চোখের পলকে নগর বন্দর, এমন কি আপনার ঐ উড়ন্ত চাকতিটাও ধ্বংস করে ফেলতে পারি আমরা।"

"কী বললেন ? হাইড্রোজেন বোমা ? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ"—বিশ্রীভাবে হাসতে লাগল রবটকুমার, —আরে, ও সব তো হাজার বছরের পুরানো অস্ত্র, কবেই বাতিল করে দিয়েছি আমরা—"

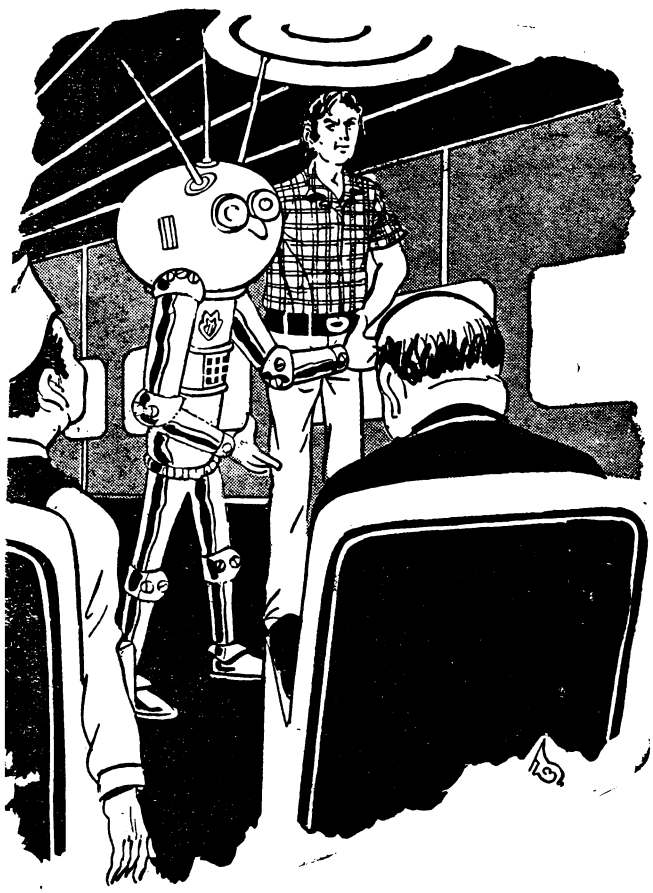

—"এতক্ষণ ধরে দেখেও কী আপনারা কিছুই বুঝতে পারছেন না?"

অবাক্ হয়ে মন্ত্রীমশায় বললেন,—"বাতিল?"

"হ্যাঁ, বাতিল। শুনুন তবে অতীত ইতিহাস। মঙ্গলগ্রহের উত্তরে আর দক্ষিণে দুই জাতি ছিল তখন। দুই জাতির হাতেই ছিল ঐ হাইড্রোজেন বোমা, আর অন্য সব আনুষঙ্গিক অস্ত্র। আদর্শগত কারণে উত্তর মাঙ্গলিক আর দক্ষিণ মাঙ্গলিকে ছিল প্রচণ্ড বিরোধ। শেষটায় দুই জাতির মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ হয়, উভয় পক্ষই নির্বিচারে হাইড্রোজেন বোমা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক অস্ত্র ব্যবহার করেছিল। ফলে ঐসব বোমার আঘাতে দুটো জাতিই সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস হয়ে গেল। মাঙ্গলিক বলতে মঙ্গল গ্রহে কেউ বেঁচে রইল না।"

শিউরে উঠে মন্ত্রীমশাই বলল,—"কেউ বেঁচে রইল না?"

"না, একটি জনপ্রাণীও না।"

ফশ করে বলে উঠল যন্ত্রবিদ,—"সবাই যদি মারা গিয়েই থাকে তা হলে তুমি এলে কোত্থেকে হে?"

এ কথাটা খেয়ালই করেনি কেউ। হাঁ হাঁ করে উঠল মন্ত্রীমশাই,—"ঠিক তো, ঠিক তো,—তুমি তা হলে কোত্থেকে এলে রবটকুমার?"

রবটকুমার একবার সবার মুখে তাকাল। হয়তো বা বিস্ময় ফুটে উঠল তার চোখের দৃষ্টিতে। গম্ভীর ভাবে বলল,—"এতক্ষণ ধরে দেখেও কি আপনারা কিছুই বুঝতে পারছেন না?"

মাথা চুলকে মন্ত্রীমশাই বললেন,—"কৈ, না তো—"

"আরে আমি যে মাঙ্গলিক নই, কোনো প্রাণীই নই আদপে। আমি তো রবট, যাকে বলে যন্ত্রমানব।"

"এঁ্যা!" রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, কোটাল, সওদাগর, সেনাপতি, পাত্রমিত্র, যন্ত্রবিদ সবাই একসঙ্গে বলে উঠল—"তুমি তাহলে মানুষ নও? তুমি একটা যন্ত্র?"

"হ্যাঁ, তবে যন্ত্র বলে আমাকে অবহেলা করবেন না। আর সব ব্যাপারে আমি মানুষের মতোই,—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যথা-বেদনা, রাগ, দ্বেষ, হিংসা সবই আমার আছে, নেই শুধু হৃদয়। আমরা যন্ত্র-মানুষেরা হৃদয়হীন। মাঙ্গলিকের ধ্বংসস্তূপ থেকে আমাদের জন্ম। হাজার বছরের বিবর্তনের ফলে আমরা একটি নিখুঁত মানুষ। আমরা সবাই এক ছাঁচে ঢালা, বুদ্ধি বিবেচনা সবারই সমান। গত হাজার বছর ধরে আমরাই রাজত্ব করে আসছি মঙ্গলগ্রহে।"

সভার সবাই আর একবার এক সঙ্গে বলে উঠল,—"আশ্চর্য, আশ্চর্য!"

রবটকুমার আবার বলল,—"আমার সব পরিচয় তো পেলেন, এবার কেশবতী রাজকন্যাকে নিয়ে আসুন, ওকে নিয়ে চলে যাব আমরা। উড়ন্ত চাকতিতে চাপিয়ে ওকে মঙ্গলগ্রহে নিয়ে যাব। আমাদের হৃদয়হীন দেশে হৃদয়ের ছোঁয়া লাগুক। ওকে আমাদের চাই-ই চাই।"

মন্ত্রীমশাই বলল,—"কিন্তু যা চাওয়া যায় তা কি সব সময়ে পাওয়া যায় রবটকুমার?"

এক পা এগিয়ে এসে কড়া গলায় রবটকুমার বলল,—"তার মানে?"

"মানে রূপকথার কাল অনেক দিন আগেই শেষ হয়ে গেছে। পৃথিবী এখন ঘোর বস্তুতান্ত্রিক, বাচ্চারাও আর এখন রূপকথা শুনতে চায় না। দেশে এখন রাজাও নেই, রাজকন্যাও নেই। কেশবতী রাজকন্যাকে পাওয়া যাবে শুধু ঠাকুরমার ঝুলিতে।"

রাষ্ট্রপতির দিকে আঙুল তুলে বরটকুমার বলল,—"রাজা নেই? তা হলে উনি কে?"

"উনি দেশের রাষ্ট্রশক্তির প্রতিক, রাষ্ট্রপতি। সরকারের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান, রাজা নন।"

মন্ত্রীমশাইয়ের কথা শুনে রবটকুমারের মুখখানা ছাই ছাই হয়ে গেল। মাথার দণ্ডগুলো কাঁপতে লাগল, পোশাকের উজ্জ্বল আভাও ম্লান হয়ে গেল। বিচলিত ভাবে বলল,—"হায়, আমার পার্থিব অভিযানটাই নিস্ফল হয়ে গেল। এত আশা, এত উদ্যম, এত আগ্রহ,—সব ব্যর্থ হল। পৃথিবী থেকেও রূপকথা বিদায় নিয়েছে? পৃথিবীতে এখন আর রাজা—রানী—রাজকন্যা—মন্ত্রীপুত্র—কোটালপুত্র—বণিকপুত্র কেউই নেই। পৃথিবীর মানুষও কি ক্রমে ক্রমে রবট হয়ে উঠবে? হয়ো না, হয়ো না, তোমরা কিছুতেই রবট হয়ো না। যন্ত্রের সুযোগ সুবিধা নিপুণতা আর আরাম যতোই থাক, তার কিন্তু হৃদয় নেই। হৃদয়হীন হবার অভিশাপের কথা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। বিদায় বন্ধু, বিদায়।"

রবটকুমার চলে গেল, রেখে গেল বেদনার একটি রেশ।

সভায় সবাই স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

সভা ভঙ্গ করে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রভবনে চলে গেলেন। ছাতে উঠে দূরবীন দিয়ে দেখলেন যে আকাশ আলো করা একটা উজ্জ্বল তারা তীব্র বেগে মহাকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে।

———

অদ্বিতীয় সার্জেন—

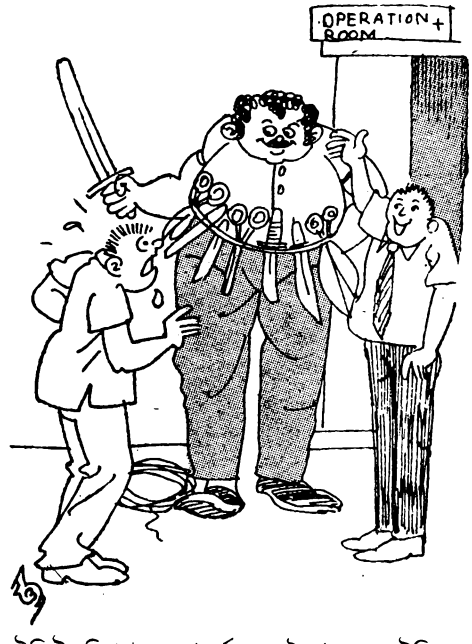

ইনিই বিখ্যাত সার্জেন বটব্যাল। ইনি একলাই আপনার অপারেশানটা করে দেবেন। না না, জবাই করবেন না।

যুগে যুগে : দিলীপ দাস

হুগলী জেলার গ্রাম-
এই বাড়ীতেই ক্ষুদিরাম চাটুজ্জের মেয়ে কাত্যায়ণীর বিয়ে হয়েছে। কদিন হল তাকে ভূতে পেয়েছে।
হুঁ, শুনছি কাত্যায়ণীর বাবা শীগ্‌গির এখানে আসবেন
ঐ তো ক্ষুদিরাম বাবু আসছেন।
ক্ষুদিরাম বাবুকে দেখতে দেবতার মত। কামার পুকুরে ওঁর মত তেজস্বী ধার্মিক ব্রাহ্মণ আর কেউ নেই।
ঠিক বলেছিস। সৎ না হলে কেউ জমিদারের মুখের উপর বলতে পারে মিথ্যে সাক্ষী দেব না!
জমিদারের চক্রান্তে ওনার সব সম্পত্তি গেছে এখন কামার পুকুরে আছেন। বড় ছেলে রামকুমার আর মেয়ে কাত্যায়ণী
হ্যাঁ, কয়েক বছর হল ওনার রামেশ্বর নামে একটি ছেলে হয়েছে।
চল ভিতরে গিয়ে ব্যাপারটা দেখি। কিন্তু এখন ওর সংসার চলে কি করে?
ভগবানে বিশ্বাস, তাই তাঁর অভাব হয় না।

বাড়ীর মধ্যে ভূতে পাওয়া কাত্যায়ণীকে ঘিরে বেশ ভিড় হয়েছে। ওঝাও এসেছে
এই মন্ত্রপড়া সরষে মারছি শীগগির এই মেয়েটাকে ছেড়ে চলে যা
নাঁ যাঁব নাঁ তোঁর ঘাঁড় মঁটকাবোঁ
বুঝলেন বাবুরা, এ বড় দুষ্টু ভূত আমার মন্ত্রে কাজ হবে না
দেখি দেখি কি হয়েছে। তুমি সরে যাও।
তুমি কে? তুমি একে কষ্ট দিচ্ছ কেন?
আঁমি ঐঁ নিম গাঁছে থাঁকি। আঁমার বঁড় কঁষ্ট।
তুমি আমার মেয়েকে ছেড়ে দাও
তুঁমি আঁগে বঁল আঁমার জঁন্য গয়াঁয় পিঁন্ডি দেঁবে।
তুমি চলে গেছ, জানব কি করে
ঐঁ নিম গাঁছের ডাঁলটা ভেঁঙে পঁড়বে।
২

(ক্রমশঃ)

বুদ্ধির জোরে

গৌতম গুপ্ত

বহুদিন আগেকার কথা। কিষাণগড় নামে এক দেশ ছিল, আর সেই দেশের রাজা ছিলেন নক্ষত্রবর্মন। তিনি ছিলেন যেমন পণ্ডিত তেমনি পরাক্রমশালী। তাঁর রাজত্বে ছিল না কোন অনাচার, তাই প্রজারা ছিল খুব সুখী ও সমৃদ্ধ। কিন্তু রাজার কোন পুত্র না থাকায় তাঁর মনে কোন সুখ ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর কাকে তিনি সিংহাসনে বসাবেন তা তিনি দিন রাত চিন্তা করতেন। রাজার এহেন দুঃখে প্রজারাও ছিল দুঃখিত।

এমনই একসময়ে সেই রাজ্যে এলেন এক নামজাদা জ্যোতির্বিদ। রাজা তাঁকে নিজের প্রাসাদে নিয়ে এলেন। তিনি গণনা করে বললেন, শীঘ্রই রাজা পুত্রসন্তান লাভ করবেন, কিন্তু সেই পুত্রের একটি হাত ও একটি পা থাকবে না। এই বলে তিনি বিদায় নিলেন।

যথাসময়ে রানীর একটি পুত্র হল এবং দেখা গেল সেই জ্যোতির্বিদের কথামত তার একটি হাত ও একটি পা নেই। পুত্র লাভ করা সত্ত্বেও রাজা খুশী হতে পারলেন না, কারণ এই পুত্রকে দিয়ে তো রাজকার্য চলবে না। সে যুদ্ধ করে রাজ্য জয় ও রাজ্য রক্ষাই বা করবে কি করে?

দেখতে দেখতে আরও পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। রাজপুত্র গ্রহবর্মন এখন পাঁচ বছরের বালক। রাজা তার পড়াশুনার জন্য দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতকে নিযুক্ত করলেন। রাজপুত্র ছিল অত্যন্ত মেধাবী। তাই অল্প কিছুদিনের মধ্যেই যে সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করে নিল। রাজপুত্র গ্রহবর্মন যখন চৌদ্দ বছরে পা দিল, সেই বছরেই রাজামশাই পড়লেন কঠিন রোগে। তিনি বুঝলেন যে, তিনি আর বেশী দিন বাঁচবেন না। তাই তিনি মন্ত্রীমশাইকে ডেকে বললেন, "দেখুন মন্ত্রীমশাই, আপনিই এই রাজ্যে আমার একমাত্র বিশ্বস্ত ব্যক্তি, তাই আপনার কাছে আমার এই অনুরোধ যে, গ্রহবর্মনকে দেখবেন এবং তাকে সৎপথে চালিত করে আমার এই রাজ্য রক্ষা করবেন।"

মন্ত্রীমশাই রাজী হলেন। তাতে রাজা যারপরনাই আনন্দিত হলেন এবং নিশ্চিন্তে পরলোকের পথে যাত্রা করলেন।

রাজামশাই মারা যাওয়ার পর রাজপুত্র গ্রহবর্মন সিংহাসনে বসলেন এবং মন্ত্রীমশাইএর সাহায্যে সুষ্ঠুভাবে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। তিনি যখন দরবারে আসতেন তখন এমন পোশাক পরে আসতেন যাতে তাঁর সমস্ত দেহটাই ঢাকা পড়ে যেত। বোঝাই যেত না যে তাঁর একটা হাত, একটা পা নেই। পা অবশ্য একটা কাঠের লাগিয়ে নিয়েছিলেন।

এদিকে হয়েছে কি, প্রতিবেশী রাজা রাজেন্দ্রসিংহ, রাজার মৃত্যুর খবর পেয়ে কিষাণগড় আক্রমণ করবার তোড়জোড় শুরু করে দিলেন। গুপ্তচরের মুখে এই সংবাদ পেয়ে মন্ত্রীমশাই ও রাজা গ্রহবর্মন খুবই চিন্তায় পড়লেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত হওয়া খুবই অসম্ভব। তা ছাড়া রাজা যেখানে নিজে যুদ্ধ করতে পারবে না, সেখানে সৈন্যেরাই বা মনোবল পাবে কোথা থেকে? এই সব চিন্তা করে রাজা মন্ত্রীমশাইকে দূত মারফত রাজেন্দ্রসিংহকে জানাতে বললেন যে, তাঁকে তর্কযুদ্ধে হারাতে পারলে তিনি তাঁর রাজত্ব রাজেন্দ্রসিংহকে দিয়ে দেবেন এবং তিনি বনবাসী হবেন। এতে অনর্থক রক্তপাতও বন্ধ হবে।

দূত মারফত এই সংবাদ পেয়ে রাজেন্দ্রসিংহ আনন্দেই রাজী হয়ে গেলেন, কারণ তিনি জানতেন

যে, তাঁর দেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ব্রহ্মানন্দ নিশ্চয়ই অনায়াসে গ্রহবর্মনকে পরাস্ত করতে পারবেন, আর তার ফলে বিনা যুদ্ধেই কেল্লা ফতে হবে। তিনি ব্রহ্মানন্দকে দূতের সঙ্গে কিষাণগড়ে পাঠালেন।

এক শুভদিন দেখে রাজা গ্রহবর্মন এবং পণ্ডিত ব্রহ্মানন্দের মধ্যে তর্কযুদ্ধ শুরু হল। কিন্তু অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারায় পণ্ডিতের পরাজয় হল। তিনি মাথা হেঁট করে দেশে ফিরে গেলেন। এদিকে গ্রহবর্মন নূতন করে সৈন্য সংগ্রহ করতে আরম্ভ করলেন, কারণ তিনি জানতেন যে, পণ্ডিতের মুখে পরাজয় বার্তা শুনে রাজা রাজেন্দ্রসিংহ কিষাণগড় আক্রমণ করবেনই।

দিন সাতেক পরে তিনি খবর পেলেন যে, রাজেন্দ্রসিংহ বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে কিষাণগড়ের দিকেই এগিয়ে আসছেন। ইতিমধ্যে রাজা গ্রহবর্মনের মনে এক নূতন পরিকল্পনা দেখা দিয়েছে। তিনি মন্ত্রীমশাইকে ডেকে বললেন—"আপনি সারা রাজ্যে এই বলে ঢেঁড়া পিটিয়ে দিন যে এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর কৃপায় আমি আমার হারান অঙ্গগুলি লাভ করেছি এবং এই যুদ্ধে আমি নিজেই সৈন্য পরিচালনা করব আর যাবার সময় আপনি আপনার পুত্রকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন।"

রাজার আদেশ মত মন্ত্রীপুত্র যখন রাজার কাছে এল তখন তিনি তাকে বললেন, "দেখ বন্ধু, আমি জানি তুমি অস্ত্রবিদ্যায় খুবই পারদর্শী। তাই আমি তোমায় একটা কঠিন কাজের ভার দিতে চাই এবং তোমার সাফল্যের উপরই নির্ভর করছে দেশের ভবিষ্যৎ।"

এই কথা শুনে মন্ত্রীপুত্র রাজী হয়ে গেলেন।

মন্ত্রীপুত্রের সম্মতি পেয়ে রাজা খুশী হয়ে বললেন, "আমি তোমায় ঠিক আমার মত করেই সাজিয়ে দেব। তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে ঠিক রাজার মত

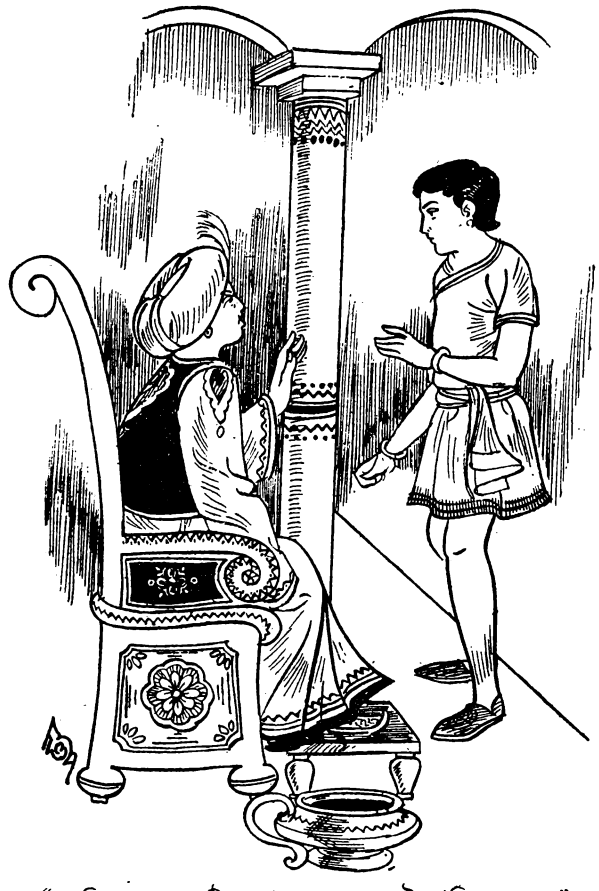

—"আমি তোমাকে ঠিক আমার মত করেই সাজিয়ে দেব।"

আচরণ করবে। আমি মনে করি এতেই আমরা জয়ী হব।"

ইতিমধ্যে রাজ্যের লোকেরা ঢেঁড়া শুনে খুবই আনন্দিত হল। তারা ভাবল, রাজা যখন নিজেই যুদ্ধ করবেন, তখন জয় আমাদের সুনিশ্চিত। এর ফলে রাজ্যের লোকেরা স্বেচ্ছায় দলে দলে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে লাগল।

দুই দেশের মধ্যে লেগে গেল ভীষণ যুদ্ধ। কিষাণগড়ের সৈন্যেরা মন্ত্রীপুত্রের অধীনে নূতন উদ্যমে যুদ্ধ করে শত্রুকে পরাস্ত করলে। কিষাণগড় বিপদমুক্ত হল। যুদ্ধে জয়লাভ করে মন্ত্রীপুত্র যখন ফিরে এলেন, রাজা তাকে আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং সেনাপতির শূন্য পদে নিযুক্ত করে রাজা সুখে ও নির্বিঘ্নে রাজত্ব করতে লাগলেন।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

(৮)

দ্রাঘিমা ৮৮, অক্ষরেখা ৫২। অষ্টাশি-বায়ান্ন! অষ্টাশি-বায়ান্ন! ক্রমাগত আউড়ে যাচ্ছে চিদাম্বরম্। মুখস্থ জিনিসগুলো ভুলে যায় মানুষে, শমির দৃষ্টি পড়লে। চিদাম্বরম্ শমিঠাকুরকে দৃষ্টি দেবার সুযোগ দেবে না। অবিরাম আউড়ে যাচ্ছে—অষ্টাশি বাই বায়ান্ন। অষ্টাশি বাই বায়ান্ন!

কেটেছে পনেরো দিন। ডাইরি রাখছে সঞ্জয় চিদাম্বরম দু'জনেই, দিন তারিখ যাতে ভুল হয়ে না যায়। উপরন্তু, আজ যা ঘটছে জীবনে, কাল যাতে তা স্মৃতিপট থেকে মুছে যেতে না পারে। লিখছে দু'জনেই, নিজেরটা কেউ কাউকে দেখায় না, অন্যেরটা দেখতেও চায় না কেউ। ফলে, একই ঘটনার দু'রকম ছবি ফুটে উঠছে দু'জনের বর্ণনায়। সঞ্জয় হয়ত লিখল—গাছের মাথা থেকে প্রলয় গর্জন শুনেছি কাল রাতে। কে বলে, এ বনে সিংহ নেই? থাকলে আমি অসুখী হব না। থাক এই হতভাগাটা সিংহের পেটেই। একা থাকাই আমার দরকার এখন। রাস মোজাফ্ফারের ব্যাপার আবার চাই না ঘটাতে।

ঠিক সেই গর্জনটাকে উপলক্ষ্য করেই চিদাম্বরম্ ওদিকে হয়ত লিখে বসে আছে—মেঘ ডাকছিল না কি রাত্রে? সিংহের ডাক হতে পারে না, কারণ এ বনে সিংহ নেই। লিখছে "আন্-এক্সপ্লোর্ড আফ্রিকা"। না, সিংহের ডাক নয়। আমার ত সন্দেহ, সঞ্জয় ভেন্‌ট্রিলোকুইজম্ জানে। নিজেই সিংহের ডাক ডেকে আমায় ভয় দেখাতে চাইছে, যাতে প্রাণ নিয়ে আমি আদ্দিস-আবাবায় পালিয়ে যাই আবার। খোঁড়া বালকের মত মাথা নীচু করে ঢুকে পড়ি জেলখানার গোয়ালে। ঐটি চিদাম্বরমের ধাতুতে নেই বৎস! গান্ধীজির বেয়াইয়ের দেশের লোক আমি। "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" আমার মূলমন্ত্র।

...পনেরো দিনই হল বটে। পনেরো দিন আগের সেই পরিস্থিতি চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে এখনো। চিদাম্বরম্ এমব্যাসির লকার থেকে চুরি করে এনেছে শতানীকদের গচ্ছিত সেই প্যাকেটটা। পথে খুলে দেখতে সাহস পায়নি। বাড়িতে ঢুকতেই দেখল সঞ্জয় দোর আগলে দাঁড়িয়ে আছে। "কাজ হাঁসিল, তা তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। দেখি জিনিসটা।"—সে হাত বাড়িয়ে দিল।

"কী মুশকিল! সরে দাঁড়াও, ঢুকতে দাও আগে"—দাঁত খিঁচিয়ে উঠেছিল চিদাম্বরম্।

"জিনিসটা দেখি আগে। ঘর পালিয়ে যাচ্ছে না, ঢুকো এখন ধীরে সুস্থে।"—সঞ্জয়ের দুই চোখে যেন ছুরি ঝলকাচ্ছে দু'খানা।

চিদাম্বরমের মনে পড়ে গিয়েছিল, প্রথম পর্বের সহকর্মী মোজাফ্‌ফারকে নিজের হাতে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে এসেছে এই সঞ্জয় সিকদার। আর তর্কাতর্কির সাহস হল না চিদাম্বরমের। সিঁড়িতে লোক নেই। সে জামার ভিতর থেকে বার করে দিল পুলিন্দাটা। এইবার পথ ছাড়ল সঞ্জয়। ঘরে ঢুকল সেই পুলিন্দাটি হাতে নিয়ে।

চিদাম্বরম্ দোর বন্ধ করল ভিতরে ঢুকে। গায়ের কোট খুলতে খুলতেই বলল—"আমাকে মোজাফ্‌ফারের পথে পাঠানো তোমার সাধ্য হবে না বন্ধু। এই দেখ, পিস্তল সারাক্ষণ রয়েছে আমার পকেটে। প্যাকেট তুমি নিতে পার, কারণ ওর উপরে তোমার দাবি যতই অকিঞ্চিৎকর হোক, সেটা আমার দাবির চাইতে অন্ততঃ বেশী। রাখতে তুমি পার, কিন্তু ওতে যা-কিছু থাকুক, তার উপরে আমার অর্দ্ধেক অধিকার যে-মুহূর্তে তুমি অস্বীকার করতে চাইবে, গুলি আমি সেই মুহূর্তেই চালাব—তা ঠিক জেনো। হুঁ—হুঁ—ববাবা! দেড় হাজার রূপেয়া মাইনের চাকরিটা খুইয়েছি, জেলের ভিতরে

পকেট থেকে বার করে পিস্তল হাতে নিয়েছে চিদাম্বরম্।

এক পা ঢুকিয়েই আছি, এ-সব খেলার কথা নয়। বার কর, কী আছে প্যাকেটে।"

সত্যিই কোটের পকেট থেকে বার করে পিস্তল হাতে নিয়েছে চিদাম্বরম্। সঞ্জয় আশা করেনি যে বন্ধু গোড়াতেই এমন বেয়াড়া গাইবে। লোকটাকে দেখতে শুনতে নেহাৎ মিনমিনে গোবেচারা বলে মনে হয়। সে যে হঠাৎ এমন ফণা তুলবে, এটা ধারণা করেনি সঞ্জয়।

কাজেই এখন সে আপোষের পথ ধরল। আপাততঃ ত ঠাণ্ডা হক চিদাম্বরম্। দুর্গম পথে একটা সঙ্গী থাকা ভাল। নিজের স্বার্থেই সে সাহায্য করবে সঞ্জয়ের। আর সঙ্গী না করেই বা করা যাবে কী? খুন করা? নিরাপদ নয়। ফাঁকি দিয়ে ফেলে যাওয়া? মরিয়া হয়ে ও সুব্বারাওয়ের কাছে গিয়ে সব কথা বলে দিতে

পারে। এই অষ্টাশি-বায়ান্নর নিশানা ধরিয়ে দিতে পারে তাঁকে। তা হলেই সর্বনাশ। ঐ পথেই, ত যেতে হবে সঞ্জয়কে! ঐ পথেই যদি পুলিস ছোটে তার পিছনে? ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় বারো আনা। কবি বর্ণনা দিয়েছেন—'রোগী যেন নিম্ব খায় মুদিয়া নয়ন'। তা সঞ্জয় অবশ্য চোখও বোজেনি, বিকৃত করেনি মুখও। বুদ্ধিমান লোক ও। ওভাবে মনের ভাব অন্য কাউকে সে জানতে দেবে কেন? কিন্তু বাইরে কোন ভাবান্তর প্রকাশ না করলেও, মনটা তার রীতিমত তেতো হয়ে গিয়েছে চিদাম্বরমের একগুঁয়েমির জন্যই। এত হিসেবী, সতর্ক, বেপরোয়া লোককে নিয়ে কাজ করা যায় না। ছাড়ান-কাটান একটা ঘটবেই। আজ হোক বা কাল হোক। তবে সঞ্জয় এবার হুট করে করবে না কিছু। যেমন করেছিল মোজাফ্ফারের বেলায়। ওতে ঝামেলা হয়, পুলিস লাগে পিছনে। এবার সঞ্জয় রয়ে সয়ে কাজ করবে। শ্রীকৃষ্ণ একশো অপরাধ ক্ষমা করেছিলেন শিশুপালের। চিদাম্বরম্ এপর্যন্ত মোটে একটাই করেছে অপরাধ। সেটা ঐ—ঐ পিস্তল-দেখানো।

রয়ে সয়ে কাজ। কাজেই সব-কিছু দেখাতে হল প্যাকেট খুলে। একটা চ্যাপটা বাক্স, পাতলা কাঠের। উপরে পুরু কাগজের মোড়ক, ভিতরে তুলোর প্যাডিং। তার মধ্যে আধখানা সোনার মুকুট। সেই আধখানাতেই তিনটে জ্বলজ্বলে হীরে। একটা উপরদিকে, দুটো নীচে। অর্থাৎ পুরো মুকুটখানা যখন মাথায় পরতেন মহারাজ শশাঙ্ক, তখন তাঁর কপালের উপরে এক লাইনে শোভা পেতো চার চারটি হীরে, আর মুকুটের চূড়ায় জ্বলত পাশাপাশি দু'খানা। উঃ, মুখখানা সূর্যের মত দীপ্তি পেত, বল!

মুকুট যে-অবস্থায় আছে, বেচলে তিন চার লক্ষ টাকা অনায়াসে হতে পারে। আদ্দিস-আবাবার বাজারেই হতে পারে। কিন্তু বেচবার কথা সঞ্জয়ের বা চিদাম্বরমের একবারও মনে হয়নি। যেমন হয়নি এর আগে দুঃস্থ, অর্ধাশনে অভ্যস্ত স্কুলমাস্টার নকুল চৌধুরীর। অথবা সেই নকুল চৌধুরীর ঊর্ধ্বতন চল্লিশ পুরুষের মধ্যে কোন একজনেরও।

না না, বিক্রির কথাই ওঠে না। তুলোট কাগজের লিখন বার বার পড়ছে দুজনে। এই যে এই আধখানা মুকুট, এর বাকী আধখানা আছে বিস্তীর্ণ পৃথিবীর অন্য কোন অংশে। সেই আধখানা যদি খুঁজে বার করা যায়, দুটো অর্ধাংশ যদি জুড়ে ফেলা যায় এক সাথে, তা হলে সেই সফল খোঁজারুর ভাগ্যে পুরস্কার মিলবে একটা আস্ত স্বাধীন রাজ্য। শূন্য সিংহাসন নিয়ে সেই রাজ্য নিশ্চয়ই এই মুহূর্তে প্রতীক্ষায় আছে সেই খোঁজারুর—নাম যার সঞ্জয়—ওরফে বিশ্বজিৎ।

চিদাম্বরম্ও ভাবছে একই কথা। কেবল কথার শেষ দিকে যে নামটা তার মনে উদয় হচ্ছে, সেটা সঞ্জয় নয়, সেটা আপ্তে চিদাম্বরম্—

হ্যাঁ, দুই আধখানা মিলবার সময় যে আজ এসেছে, তাতে সন্দেহ করার উপায় নেই। কারণ কৃষ্ণভারতীর ভবিষ্যবাণীর কথা ত স্পষ্টই উল্লেখ রয়েছে তুলোটের বয়ানে—"চল্লিশ পুরুষ পরে"—অর্থাৎ মোটা হিসেবে তেরোশো বছর পরে।

সময় হয়েছে এইবার। "আন্‌এক্সপ্লোর্ড আফ্রিকা" নামক কেতাবের লেখক কে সেই গবেষক ভদ্রলোক। কীভাবে কতদিনের পরিশ্রমে তিনি অন্ধ আফ্রিকার মহারণ্যে পাহাড়ে-ঘেরা অজানা এক আশ্চর্য রাজ্যের সন্ধান পেলেন, তা নিয়ে কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই সঞ্জয়ের বা চিদাম্বরমের। এইটুকুই এই যুগল স্বার্থসন্ধানীর পক্ষে আনন্দের কথা যে, সে ভদ্রলোক করেছিলেন

গবেষণা আর পরিশ্রম, এবং লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন তাঁর গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে মোটাসোটা এক পুঁথির আকারে।

হ্যাঁ, পুঁথিখানা মোটাই হবে নিশ্চয়। এ প্যাকেটে তার মাত্র দুটো পৃষ্ঠার নকল পাওয়া যাচ্ছে। নকলের শুরুতে লেখা আছে—"আন-এক্সপ্লোর্ড আফ্রিকা বইয়ের ছয়শো আটাত্তর আর উনাশি পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি—" উঃ, ছয়শো—ও—ও আটাত্তর! থান ইটের সমান মোটা!

হঠাৎ সঞ্জয় খট খট করে হেসে উঠল। চিদাম্বরম্ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার পানে তাকাতেই সে গম্ভীর হয়ে গেল আবার। আগের মত ভ্রূ কুঁচকেই বলল—"বাংলা মুলুকে একটা কথা আছে, 'যার ধন তার ধন নয়, নেপো মারে দই'। এ-মুকুটের মালিক হল ঐ গাড়োল রাহুল। মেহনত করে আনএক্সপ্লোর্ড আফ্রিকার এতখানি নকল করে আনল ঐ চিনির বলদ শতানীক। ওদের কারও ভোগেই কিছু লাগল না। মাঝখান থেকে রাজ্য দখল করতে যাচ্ছি আমি—"

"আমরা—আ—আ"—সঞ্জয়ের ভুল সংশোধন করে দিল চিদম্বরম্। আর তার দীর্ঘায়িত—আ—আ লয়ে পৌঁছোবার আগেই সঞ্জয়ের ঘুষি-পাকানো ডান হাত সাঁ করে ছুটে গেল সমুখেই উপবিষ্ট চিদাম্বরমের নাসাগ্র লক্ষ্য করে! এঃ। একটু আগেরই সেই সাধু সংকল্প—"শত অপরাধ করিব ক্ষমা"—তার কথা দুই মিনিটেই ভুল হয়ে গেল সঞ্জয়ের!

শুধু ভুলই যে হল, তাও নয়। সেজন্য পস্তাতেও হল তৎক্ষণাৎ। চিদাম্বরম্ অসতর্ক হয়নি এক মুহূর্তের তরেও। সঞ্জয়ের ঘুষি যে বস্তুটাতে গিয়ে ধাক্কা খেল, তা চিদাম্বরমের নাক নয়, পিস্তল।

জব্দ! বিনা বাক্যব্যয়ে হাত গুটিয়ে এনে মুকুট এবং তুলোট এবং আন্‌এক্সপ্লোর্ড আফ্রিকার উদ্ধৃতি সব আবার আগের মত কাঠের বাক্সে প্যাক করে ফেলল সঞ্জয়। সেটা রাখল জামার ভিতরে। বাঁয়ের দিকে পাঁজরা-জোড়া একটা পকেট সে নিজের হাতে বানিয়ে নিয়েছে, লাইনিংয়ের গায়ে রুমাল সেলাই করে।

সব পুরে ফেলল, বাকী কেবল কম্পাস এবং দুই একটা যন্ত্রপাতি। এগুলো সঞ্জয় সংগ্রহ করে নিয়েছে আদ্দস-আবাবাতেই, চিদাম্বরম্ প্যাকেট সরাবার সৎকর্মে সাফল্য লাভের আগেই।

এখন সেইগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে, সেইগুলোর দিকে তাকিয়েই, সে সুরটাকে যথা-সম্ভব মোলায়েম করে ডাকল—"কাম্ অ্যালং ব্রাদার্, হেল্‌প্ মী, ঠিক পথে যাচ্ছি কিনা, যাচাই করে নিই একবার। জানই ত, এক চুল এদিক ওদিক হলে পাঁচশো মাইলের হেরফের ঘটে যাবে।"

চিদাম্বরম্ সাড়া দিচ্ছে না দেখে সে এবার মুখটা ঘুরিয়ে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। শান্ত অথচ কঠিন কণ্ঠে বলল—"ভুলতে তুমি পারছ না, দেখছি। না পারা কিছু আশ্চর্য নয়। নাকে যে ঘুষি মারতে আসে, তাকে সত্যিই ক্ষমা করা শক্ত। বিশেষ করে সেই ঘুষি-তোলার ব্যাপারটা যেখানে থাকে বাহ্যিক উপসর্গ মাত্র, আসল ব্যাধি যেখানে থাকে মনের গভীরে লুকোনো। আমাদের সেই আসল ব্যাধি—অর্থাৎ উচ্চাশাজনিত হিংসাবৃত্তি। সেটাকে সেই গভীর থেকে উপড়ে টেনে বার করে ফেলা অন্তর থেকে, সে কাজের মত গান্ধীয়ানা আমাদের কারো চরিত্রেই নেই। অতএব—"

"অতএব?"—চিদাম্বরমের কণ্ঠে ফুটল ব্যাঙ্গের সুর।

"অতএব, এস, একটা চুক্তি করি আমরা—প্যাক্ট। জেন্টলম্যানস্ প্যাক্ট। আপাততঃ আমরা বন্ধুভাবে, যৌথভাবে চেষ্টা করে যাব অভীষ্ট লক্ষ্যে

পৌঁছোনোর জন্য। অকুণ্ঠভাবে সহযোগিতা করে যাব পরস্পরের সঙ্গে। যা না করলে উপায় নেই। কেমন, একথা নিশ্চয় মানো যে, যে-কোন একজনের পক্ষে এই অতি দুরূহ অভিযানে সফল হওয়া একেবারে অসম্ভব?"

চিদাম্বরম্ মাথা নাড়ল। বেশ একটু চিন্তিত ভাবেই নাড়ল। সম্মতিই জানাল বোধ হয় মাথা নেড়ে। কিংবা বলাও যায় না সে কথা জোর করে। ওর মুল্লুকের লোকের মাথা-নাড়া একটু আলাদা ধরনের। খুব ওয়াকিবহাল যারা নয়, তাদের পক্ষে সে মাথা-নাড়া দেখে বোঝা শক্ত যে, ওটা সম্মতি না আপত্তিসূচক। হাঁ বা না যে কোন মানেই করা যায় ওর।

সঞ্জয়ের কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামছে না। সে বলে যাচ্ছে নিজের কথা। —"হ্যাঁ, ঐ আমার প্রস্তাব। সাফল্য যতদিন না আসছে, আমরা দু'জনে একসাথে কাজ করে যাব, একেবারে একাত্ম হয়ে। তারপর অভীষ্ট সিদ্ধি যখন হবে, দু'জনে ডুয়েল লড়ব আমরা কোন এক নিভৃত স্থানে গিয়ে। একজন খতম না হওয়া পর্যন্ত চলবে সেই লড়াই। যে বাঁচবে, দুই আধখামা জোড়া দিয়ে আস্ত মুকুট সেই পরবে।"

চিদাম্বরম্ শুনছে। শুনতে শুনতে হতবাক্ হয়ে যাচ্ছে বিস্ময়ে।

সঞ্জয় আবার বলছে—"অসৎ হই, মিথ্যুক হই, ভগবান মানি। তাঁকেই সাক্ষী রেখে আমি শপথ নিতে রাজী আছি ঐরকম। তুমি? তুমি রাজী কিনা, সেইটে বল এখন—"

"রাজী না হয়ে উপায় নেই বলে মনে হচ্ছে"—চিদাম্বরম্ বলল খানিক পরে। "একটা কথা ভাবছি শুধু, ডুয়েলে দু'জনই যদি পটোল তুলি—"

"কেয়া পরোয়া?" সঞ্জয় বলল চোখ পিটপিট করে—"জোড়া-লাগানো মুকুট যার ভাগ্যে থাকে, সে পরুক।"

হরিহরাত্মা দুই বন্ধুর মত ওরা এইবার দুই মাথা একত্র করে আঁক কষতে লেগে গেল—ম্যাপের সঙ্গে মিলিয়ে জুলিয়ে নির্ণয় করতে আঁকল দ্রাঘিমা অক্ষরেখা। পাহাড়ের পরে পাহাড় দেখা যায় ম্যাপে, কে জানে কোন্ পিরামিড আকারের পাহাড় থেকে আগুনের হলকা বেরুচ্ছে ক্রমাগত। নদী দেখা যায় ম্যাপের চার দিকে আর চার কোণে বিসর্পিত। তার মধ্যে কোন্‌টার বুকে খরার দিনে অতিকায় বিষ্ণুমূর্তির প্রকাশ ঘটে, কে তা বলে দেবে?

* * *

ঠিক সেই সময়ে। সঞ্জয় চিদাম্বরম্ যে-পথ ধরে অষ্টাশী-বায়ান্নর মুলুকে চলেছে, তারই প্রায়-সমান্তরাল অন্য একটা পথে খচ্চর চলেছে দুটো, পিঠে দুজন সওয়ার নিয়ে। এ-দুটি সওয়ারের, একটি হল রাহুল, শতানীকের তাড়নায় যে এগিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে অভীষ্ট দেশের সন্ধানে, শতানীককে তার রোগশয্যায় ফেলে রেখেই।

"চুরি গিয়েছে অর্ধমুকুট, চুরি গিয়েছে সব কাগজ-পত্র সুব্বারাওয়ের হেফাজত থেকে। ঐ দুর্বৃত্ত বিশ্বজিতের অসাধ্য কাজ নেই। বিলম্বে সর্বনাশ হবে। তুমি এগিয়ে পড়। আমি পারি যদি, তোমার সঙ্গে মিলব গিয়ে। পারবই। নাও যদি পারি, ভগবান পথ দেখাবেন তোমায়। তোমার জেঠাও তাই লিখে গিয়েছিলেন, আমিও তাই বলছি, ভগবান দেখাবেন পথ। সেই একজন ছাড়া পথ দেখাবার আর কেউ নেই। আর তিনি যাকে না দেখান, শত হাতে হাতড়েও সে আঁধার থেকে বেরুতে পারে না। যাও ভাই, ভয় পেয়ো না। রাজবংশের বংশধর তুমি, ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ, নৈত্যৎত্বয্যুপপদ্যতে।"

শতানীক কবে শয্যা ত্যাগ করবেন, কবে আরণ্য পথে মৃগয়ার অভিযানে বেরুতে পারবেন, কোন কথাই নিশ্চয় করে বলতে পারছেন না কোন ডাক্তার। রাহুল অগত্যা বেরুল। শুধু এই কারণেই বেরুল যে, শতানীকের অবাধ্য হলে তিনি ব্যথা পাবেন। হারানো মুকুট যদি কোন দিন ফেরৎ না পাওয়া যায়, সে দুঃখও রাহুল সইতে পারবে, কিন্তু অনীকদার চোখে ব্যথিত দৃষ্টি ফুটবে তারই কোন আচরণে, এ কল্পনাই তার অসহ্য।

চোখের জল ফেলেই রাহুল বিদায় নিল। শয্যালীন শতানীকও হাসিমুখে তাকে বিদায় দিতে পারলেন না। শত চেষ্টাতেও রুখতে পারলেন না চোখের জল।

কম্পাস দূরবীন পিস্তল ছোরা নানা রকমের ম্যাপ লোটাকম্বল খাবার-দাবার সব কিছু কয়দিন থেকেই রাহুল সংগ্রহ করছে। এনে জমা করছে নিজের ঘরে। হোটেলের বিল সকাল বেলায়ই মিটিয়েছে রাহুল। টাকা বুঝে নিয়ে রসিদ কেটে দিয়েছে তারিখ মোবারক। কাগজটা হাতে তুলে দেবার সময় সে জিজ্ঞাসা করল—"কখন যাচ্ছেন ?"

"এই রাতটা ভোর হলেই"—

"জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, কোথায় যাচ্ছেন ?" রাহুলের মনে হল—এ প্রশ্নটা করার সময় যে-দৃষ্টি দিয়ে মোবারক চাইল তার পানে, সেটা যেন বিশেষ কোন অর্থবহ।

"যা-চ্ছি নানা দেশ দেখতে—"

তারিখ মোবারক হাসল। সে-হাসি তার ঠোঁটে একটুও ফুটল না, ফুটল শুধু তার চোখে। তারপর সে বলল—"এক সন্ধ্যায় দুজন অতিথিকে ঘরে ঢুকতে দিয়ে ঘোর বিপদে পড়েছিলেন আপনারা। তারপরেও কি আজ সন্ধ্যায় আর এক অতিথিকে ঢুকতে দেবেন ঘরে কতে ?"

কাগজটা হাতে তুলে দেবার সময় মোবারক জিজ্ঞাসা করল—"কখন যাচ্ছেন ?"

"নিজের কথা যদি বলে থাকেন, তবে সানন্দে দেব। আপনার কাছে ত কৃতজ্ঞ আমরা—" বলল রাহুল।

সন্ধ্যায় ঠিক পরেই রাহুলের ঘরে এল মোবারক। সমুখে বসে ঝুঁকে পড়ল রাহুলের দিকে। প্রায় মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি—

তারপর অত্যন্ত নীচু গলায়, প্রায় ফিসফিস করে মোবারক জিজ্ঞাসা করল—"তেরোশো বছর আগে আপনাদের বংশে কোন গুরুতর বিপর্যয় ঘটেছিল ?"

"কী ?"—চমকে উঠল রাহুল। চেঁচিয়েই উঠল প্রায়।

"চ্যাঁচাবেন না। যদি না ঘটে থাকে, যদি আপনার তেরোশো বছর আগেকার পূর্বপুরুষ নিজের মাথার রাজমুকুট চিরে দু'খণ্ড করতে বাধ্য না হয়ে থাকেন, তবে আপনাকে আর কোন কথা বলবার নেই আমার।"

রাহুল হাঁইফাঁই করছে, জলে ডুবে যাবার সময় যেমন করে মানুষ—"আর যদি-যদি—"

কথা সে শেষ করতে পারছে না দেখে মোবারকই বলল আবার—"যদি তেমন কিছু ঘটেই থাকে, তবে আমি—আমি আজ থেকে আপনার ভৃত্য। রাজভক্ত সৈনিক। কৃষ্ণভারতীর ভবিষ্যদ্বাণী গৌড়-মগধে কতজনে আজ স্মরণ রেখেছে, জানি না, কিন্তু আমার দেশে, না আমার বর্তমানের দেশে নয়, আমার সাতপুরুষ আগের পিতৃভূমিতে আজও ঘরে ঘরে জনে জন জানে সে বাণীর কথা। তেরোশো বছর পূর্ণ হল, সে-হিসাব আমি রাখি। শঙ্করাদিত্য মহারাজের পিত্তলমূর্তি আমি দেখেছি কোনার্স্থবানে। সেই মূর্তিকেই আজ আমি যেন রক্তমাংসের দেহে সঞ্জীবিত দেখছি আপনার ভিতরে। বলুন, আপনিই কি সেই, তেরোশো বছর ধরে কোনার্স্থবানের অধিবাসীরা প্রতীক্ষা করছে যে রাজবংশধরের? যদি তাই হন, আমি আপনার ভৃত্য।"

এ-কথার উত্তরে রাহুল উঠে দাঁড়াল হঠাৎ। দেখাদেখি উঠে দাঁড়াল মোবারকও। আর অমনি রাহুল আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল তাকে।

তার দিন দশেক পরে তাই আজ মহারণ্যের মাঝখানে রাহুলের সঙ্গে খচ্চরে চড়ে পথ চলেছে অ্যালায়ান্স হোটেলের সহকারী পরিচালক তারিখ মোবারক। (ক্রমশঃ)

পৃথিবীর যমজ গ্রহ

নৈশ আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র যে সিরিয়াস, তার চেয়েও পনেরো গুণ ভাস্বর হল শুক্রগ্রহ। এর এই দ্যুতির জন্য প্রাচীন রোমকেরা এর নামেই নামকরণ করেছিলেন সৌন্দর্যের দেবীর। সুদক্ষ ফটোগ্রাফারেরা নাকি শুক্রের আলোকে ফটো পর্যন্ত তুলতে পারেন।

শুক্রের ব্যাস ৭৫৮০ মাইল, পৃথিবীর ব্যাসের চাইতে সামান্যই কম। দু'টির আয়তন প্রায় সমান। এই কারণে অনেকে পৃথিবী আর শুক্রকে বলেন যমজ গ্রহ।

একটা ঘন বাষ্পমণ্ডলে শুক্রগ্রহ আবৃত। এ-বাষ্প যে কী জাতীয়, তা আগে অজ্ঞাতই ছিল। ১৯৬৭-র জুন মাসে দুই দিন আগে-পিছে রুশ মহাকাশবিমান ভেনেরা-৪ ও মার্কিন মহাকাশ বিমান মেরিনার-৫ ঐ গ্রহের অতি নিকট দিয়ে উড়ে যায়। তাদেরই পর্যবেক্ষণের ফলে কতকটা আলোকপাত হয়েছে ঐ অজানা রহস্যের উপরে।

জানা গিয়েছে যে ঐ বাষ্পমণ্ডলে শতকরা নব্বুই ভাগই হল কার্বন ডায়ক্সাইড বাকী দশ ভাগের মধ্যে নয় ভাগ হল নাইট্রোজেন ও প্রায় একভাগ অক্সিজেন। অতি সামান্য জলীয় বাষ্পও আছে, এক ভাগের এক-দশমাংশ। মোটের উপর, এরকম পারিপার্শ্বিকে জীবনের অস্তিত্ব না থাকারই কথা।

শিবাজীর ঠাকুর্দা

পূরবী দেবী

এই মালোজী, তোমার বয়েল সামলে রাখতে পার না? বললে হিন্দনী গ্রামের এক চাষী।

যখনকার কথা বলছি তখন দিল্লীর সিংহাসনে বসে জাহাঙ্গীর বাদশা রাজত্ব করতেন। সেই সময়ে পুনা জেলার অন্তর্গত হিন্দনী গ্রামে দুই ভাই বাস করত। তারা চাষবাস করে জীবন চালাতো। বড় ভাইয়ের নাম মালোজী আর ছোট ভাইয়ের নাম বিঠোজী। পদবী হল তাদের ভোঁসলে।

মালোজীর মেজাজ ছিল বড় কড়া। কেউ কিছু বললেই সে কেউটে সাপের মত ফোঁস করে উঠত। আর মনে ছিল অদম্য সাহস, গায়ে ছিল অসাধারণ শক্তি।

লোকটি যখন বয়েল সামলে রাখার জন্যে মালোজীকে বললে, তখন মালোজী বললে, বয়েল তো তোমার মত মানুষ নয়, যে বললে কথা শুনবে।

মালোজীর কথায় লোকটি চটে গেল। সে বললে, তোমার বয়েল আমার ক্ষেতে ঢুকে ফসল খেয়ে যাবে আর তুমি চোখ রাঙাবে?

মালোজী বললে, বয়েলের ক্ষিদে পেলে সে চরে খাবে। আমার আদেশে তো উপোষ করবে না? তা তুমি তোমার ক্ষেতকে সামলে রাখতে পার না?

লোকটি এ কথায় আরো চটে গেল। বললে, জানি তো, আর তোমার মত গরু নয় যে গলায় দড়ি বেঁধে এদিক ওদিক টেনে সরান যাবে?

লোকটির মনের ঝাল পুরোপুরি বেরোবার আগেই মালোজীর হাতের চড় তার গালে এসে পড়ল। চোখ রাঙিয়ে মালোজী বললে, ফের গালি দিলে মাথার টিকি ধরে ঝুলিয়ে দেব।

গায়ের জোরে পারবে না জেনে লোকটি রাগে ফুলতে ফুলতে চলে গেল।

এইভাবে প্রায়ই কোন না কোন ছুতোয়

মালোজীর সঙ্গে গ্রামের প্রতিবেশীদের খুঁটিনাটি লেগে থাকত। শেষে গ্রামের সব লোকেরা এক-জোট বেঁধে মালোজীর সঙ্গে উঠা বসা বন্ধ করে দিলে।

গ্রামের প্রতিবেশীদের সঙ্গে বনিবনা না হতে মালোজী আর তার ভাই বিঠোজী সপরিবারে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল।

ঘুরতে ঘুরতে তারা ইলোরা পাহাড়ের কাছে বিরুল গ্রামে এসে বসতি করে চাষবাস শুরু করলে। কিন্তু এখানে চাষবাস আশানুরূপ না হওয়ায় তারা চাষবাস ছেড়ে চাকরি করার কথা ভাবতে লাগল।

সেই সময়ে নিজামশাহী রাজত্বে লাখজী যাদব রাও নামে একজন সেনাপতি ছিলেন। তা ছাড়া সেখানে তাঁর জমিদারিও ছিল। অবস্থা ছিল খুব ভাল। মালোজী ও বিঠোজী এসে তাঁর সৈন্যদলে চাকরি নিলে। মাইনে হল মাসিক কুড়ি টাকা।

মালোজীর ছেলের বয়েস তখন খুব কম। বছর পাঁচ ছয় হবে। দেখতে অপরূপ সুন্দর। একদিন মালোজীর সঙ্গে তার ছেলে শাহজীকে পথে দেখে যাদব রাওর কৌতূহল হল। যাদব রাও জিজ্ঞাসা করলেন, মালোজী, ছেলেটি কে?

মালোজী বললে, এ আমার ছেলে।

বাঃ, বেশ সুন্দর ছেলে তো। একে রোজ আমার কাছে আনবে। কেমন?

তারপর থেকে মালোজী প্রায়ই যাদব রাওর কাছে ছেলেকে নিয়ে আসত। যাদব রাও তাকে যত্ন করতেন, খাওয়াতেন, আদর করতেন। ক্রমে ক্রমে তার উপর তাঁর স্নেহ জন্মাতে লাগল। এমন কি ছেলেকে অন্দরমহলেও নিয়ে যেতেম তাঁর স্ত্রী গিরিজাবাঈয়ের কাছে।

এইভাবে দিন যায়। ক্রমে হোলির দিন এসে গেল। মালোজী ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাদব রাওর বাড়ি গেল। যাদব রাও তার মনিব। তাই হোলির দিনে মনিবের পায়ে আবীর দিয়ে হোলির দিনে তাঁকে সম্মান জানিয়ে খুশী করবে।

যাদব রাও তখন অন্দরমহলে। ছেলেকে ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে মালোজী বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল।

খানিকক্ষণ বাদে যাদব রাও তাঁর মেয়ে জীজা-বাঈকে কোলে নিয়ে শাহজীর হাত ধরে বাইরে এলেন। জীজাবাঈও ছিল অপরূপ সুন্দরী।

ততক্ষণে যাদব রাওর অধীনস্থ আর সব কর্মচারী এসে উপস্থিত হয়েছে যাদব রাওর চত্বরে হোলির উৎসবে দেখা করতে।

চত্বরে এসে একটা চৌকির উপর বসে এক কোলে শাহজীকে বসিয়ে অন্য কোলে নিজের মেয়েকে নিয়ে যাদব রাও তাদের হাতে ফাগ তুলে দিলেন। দুজন বালক বালিকা পরস্পরের গায়ে মুখে রং মাখিয়ে খিলখিল করে হাসতে লাগল। তাদের ছেলেমানুষি দেখে যাদব রাওর মুখ হাসিতে ভরে উঠল। অন্যান্য কর্মচারীরাও হাসতে লাগল।

ছেলেমেয়ের হোলি খেলা দেখে মনের আবেগে যাদব রাও বলে ফেললেন, কি সুন্দর দেখতে। যেমন ছেলে তেমনি মেয়ে। দুজনে যেন রাজ-যোটক। ভগবান এদের মিলিয়ে দিলে যোগ্যে যোগ্যে মিল হবে।

মালোজী এ সুযোগ ছাড়লে না। যাদব রাও অবস্থাপন্ন জমিদার। তার মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে পারলে ছেলেরও ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে, আর তার নিজেরও ভবিষ্যৎ সুরাহা হবার সম্ভাবনা। সে জানত যে যাদব রাওর মেয়ের সঙ্গে শাহজীর বিয়ে হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। তাই যাদব রাওর আবেগে বলা অসম্ভব কথাটা লুফে নিয়ে উপস্থিত ব্যক্তিদের শুনিয়ে বললে,

আপনারা সব সাক্ষী রইলেন, সেনাপতি মশাই তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

মালোজীর কথায় যাদব রাওর হুঁশ ফিরে এল। তিনি আমতা আমতা করে বোঝাতে গেলেন যে, একথা তাঁর আন্তরিক নয় মনের উচ্ছ্বাস মাত্র। কিন্তু মালোজীর জোরালো গম্ভীর কণ্ঠস্বরে, আর উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উৎফুল্ল অভিনন্দনে কেউ আর তাঁর কথা কানেও নিলে না।

ঘটনায় মোড় ফেরাতে না পেরে অপ্রসন্ন মুখে মালোজী জীজাবাঈকে কোলে নিয়ে অন্দরে চলে গেলেন। সেদিন আর শাহজীকে সঙ্গে মিলেন না।

মালোজীর স্ত্রী গিরিজাবাঈ ছিলেন যেমন বুদ্ধিমতী তেমনি তেজস্বিনী। কথাটা শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তিনি বললেন—একটা ঘোড়সোওয়ারের ছেলে আমার মেয়েকে বিয়ে করবে! লোকটার আস্পর্ধা তো কম নয়। কালকেই ওকে বরখাস্ত করে বিদায় কর।

গিরিজাবাঈয়ের কথামত যাদব রাও তার পরদিনই মালোজী ও তার ভাই বিঠোজীকে বরখাস্ত করে বিদায় করলেন।

এই ঘটনার পর দু' তিন বছর কেটে গেছে। চাকরি থেকে ফিরে এসে মালোজী ও বিঠোজী বিরুল গ্রামে ফিরে চাষবাস শুরু করেছে।

কিছুদিন চাষবাস করার পর গ্রামের লোকেরা মালোজীর কাণ্ড দেখে অবাক্। প্রায় প্রতিদিনই কেউ না কেউ এসে মালোজীর কুঁড়েতে হাজির হচ্ছে। কয়েকদিনের মধ্যে মালোজীর অধীনে একটা বেশ বড় দল তৈরী হয়ে গেল।

তারা আরো আশ্চর্য হয়ে গেল মালোজীকে ঘোড়া কিনতে দেখে। একটা দুটো নয়, এক হাজারেরও বেশী। এই সব ঘোড়ায় চড়ে মালোজীর দলের লোকেরা নিয়ম করে কুচকাওয়াজ করতে শুরু করলে।

গ্রামবাসীদের কৌতূহলের সীমা ছাড়িয়ে গেল। তারা দলের একজনকে একদিন একলা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তোমরা মালোজীর কাছে কি কর?

তারা বললে, আমরা তাঁর মাহিনা করা অশ্বারোহীবাহিনী। যখন যা আদেশ করবেন তাই করব।

গ্রামের লোকেরা আশ্চর্য হয়ে গেল এই কথা শুনে। মালোজীরা ভাল করে খেতে পেত না এখানে। তাই তারা চলে যায় চাকরি করতে। চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়ে আবার চাষ করতে শুরু করে। ভাল করে দিন চলত না। হঠাৎ কোথা থেকে টাকা পেল সে? দেখতে দেখতে এক হাজারী অশ্বারোহী বাহিনী গড়ে তুললে!

সত্যিই কথাটা ভাববার মত। আর মালোজীর টাকা পাওয়ার ঘটনাটা শুধু অদ্ভুত নয়, অবিশ্বাস্য। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হলে অসম্ভবও সম্ভব হয়, তা মালোজীর জীবনে দেখা গেল।

একদিন রাত্রে মালোজী তার জমিতে ফসল পাহারা দিচ্ছে। এমন সময় তার নজর পড়ল ক্ষেতের পাশে একটা ঝোপের দিকে। দেখলে একটা সাপ ঝোপের পাশে একটা গর্ত থেকে বেরোচ্ছে। সাপটা মস্ত বড়, আর বিষাক্ত। সাপটা গর্ত থেকে বেরিয়ে গর্তটার চারপাশে একবার প্রদক্ষিণ করে আবার গর্তে ঢুকে গেল। পূর্ণিমার রাত্রি। তাই এসব দেখার কোন অসুবিধা হল না।

এই ব্যাপার দেখে এক পুরানো কাহিনী মালোজীর মনে পড়ল। সে শুনেছিল যক্ষরা সাপ হয়ে মাটির মধ্যে পোঁতা গুপ্তধন পাহারা দেয়। এই সাপটাও হয়তো তাই করছে। এই ভেবে মালোজী শাবল কোদাল দিয়ে গর্তটা বড় করতে লাগল। আগেই বলেছি, তার মনে ছিল অদম্য

মালোজী দেখলে. একটা সাপ ঝোপের পাশে একটা গর্ত থেকে বেরোচ্ছে। [পৃষ্ঠা ২১৫

সাহস। তাই সাপের ভয়ে এই কাজ থেকে বিরত হল না সে।

গর্তটা একটু গভীর হতে সাপটা ফোঁস করে গর্ত থেকে মাথা তুলে ভয় দেখালে।

কিন্তু মালোজী তাতে মোটেই ভয় পেল না। সাপের ছোবল থেকে একটু দূরে সরে এসে সে ধপাধপ মাটিতে কোদাল পাড়তে লাগল।

বেগতিক অবস্থা বুঝে সাপটা গর্ত থেকে বের হয়ে ঝোপের দিকে চলে গেল। তখন মালোজী গর্তটা নিরুদ্বেগে খুঁড়তে শুরু করলে। হঠাৎ শাবলের মুখে আওয়াজ হল ঠন্ করে। মালোজী নীচু হয়ে দেখলে একটা মোহর। তখন প্রচণ্ড উৎসাহে গর্তটা বড় করে ফেললে। তারপর বড় বড় সাত গামলা ভর্তি মোহর তুলে আনলে।

মোহরগুলি বাড়িতে এনে মালোজী সেগুলি গোপনে একজন শেঠের কাছে জমা রেখে দিলে। তাই থেকে কিছু মোহর নিয়ে সে এক হাজারী অশ্বারোহী সৈন্যদল গড়ে তুললে। —একথা আগেই বলেছি।

অশ্বারোহী সৈন্যদল গড়ে ওঠার পর মালোজী স্থানীয় এক জমিদারের সঙ্গে যোগ দিয়ে মোগল সাম্রাজ্যের সীমানায় হানা দিয়ে প্রচুর ধনরত্ন লুটপাট করে আনতে শুরু করলে। শুধু মোগল সাম্রাজ্য নয়, মালোজী তার পূর্বতন মনিব সেনাপতি যাদব রাওর প্রভু নিজামশাহী রাজ্যেও হানা দিয়ে অর্থ সম্পদে নিজের থলির ভার বাড়িয়ে চলল।

মোগল সেনারা হাজার চেষ্টা করেও মালোজীকে একবারও ধরতে পারলে না। কখন অতর্কিতে পঙ্গপালের মত এসে পড়ে, তারা বুঝতেই পারে না। বাধা দেবার জন্যে তৈরি হতে না হতে মালোজী তাঁর মারাঠা অনুচরদের নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। আর সঙ্গে নিয়ে যায় ধনরত্ন, গোলা বারুদ ও হালকা অস্ত্রশস্ত্র।

এই অসুবিধা নিজামশাহী রাজারও হতে শুরু

হল। ওদিকে মালোজীর সম্মান ও বীরত্বের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তখন নিজামশাহী রাজা মালোজীকে নিজের অধীনে চাকরি দিয়ে সেনাপতির মর্যাদা দিলেন। মালোজী আর সাধারণ ঘোড়সওয়ার বা চাষী নয়। এখন একজন বর্ধিষ্ণু ওমরাহ। যাদব রাওর সমকক্ষ।

মালোজীর এইভাবে উন্নতি হতে যাদব রাও নিজের মেয়ে জীজাবাঈয়ের সঙ্গে শাহজীর বিয়ের প্রস্তাব করেন।

মালোজী রাজী হয়ে বলেন, আর তো মেয়ের মায়ের অভিমান নেই? এখন তাঁর মত আছে তো?

গিরিজাবাঈ একথা শুনে বলে পাঠালেন, মেয়ের মায়ের জন্যে ঘোড়সওয়ার আজ সেনাপতি হল! আমি অরাজী হয়েছিলুম বলেই না মালোজীর ভাগ্য ফিরল। তা না হলে তাঁকে আজও ঘোড়ার পিঠে চড়ে দেশদেশান্তরে ছুটে বেড়াতে হত মনিবের হুকুমমত। মালোজীর ভাগ্য ফেরানোর জন্যে ইমাম চাই।

কথাটা মালোজীর কানে যেতে তিনি বেয়ানের কথায় একটু মুচকি হাসলেন!

শাহজীর সঙ্গে জীজাবাঈএর বিয়ে হয়ে গেল ১৬০৪ সালে। তখন শাহজীর বয়েস নয় আর জীজাবাঈয়ের সাত।

এরপর থেকে মালোজীর যশসূর্য ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। তাঁর জায়গীরের পরিমাণও সেই সঙ্গে বেড়ে যায়। প্রচুর ধনদৌলতে কোষাগার ভরে উঠতে থাকে।

এত ধনরত্ন সংগ্রহ করেও মালোজী নিজের পূর্বাবস্থার কথা কখনও ভুলে যাননি। তিনি ছিলেন শিবের ভক্ত। শিব ঠাকুর যে তাঁকে গুপ্তধন পাইয়ে দিয়েছেন এ ধারণা তাঁর একদিনও মন থেকে যায়নি। তাই তিনি আর সব

—মালোজী, তোমার কাজে আমি খুশী হয়েছি। [পৃষ্ঠা ২১৭

লুঠেরাদের মত এই সব ধনদৌলত নিজের বিলাস-ব্যসনে খরচ না করে জনসাধারণের কল্যাণে খরচ করতেন।

তখনকার দিনে মারাঠাদেশে এদিকে ওদিকে প্রায়ই জলকষ্টের কথা শোনা যেত। মালোজীর কানে গেলে তিনি অমনি পুকুর কাটিয়ে জলের ব্যবস্থা করতেন। কেউ যদি গ্রামে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে শুনতে পেতেন, অমনি গোপনে তার কাছে সাহায্য পৌঁছে যেত।

সাতারা জেলার উত্তরে এক পাহাড় আছে। পাহাড়ের উপর এক শিবমন্দির। শম্ভু মন্দির বলে বিখ্যাত। প্রতি বছর শম্ভু মন্দিরে পূজো দিতে লক্ষ লক্ষ লোক পাহাড়ে উঠত। কিন্তু

পাহাড়ের উপর না ছিল কোন ঝর্ণা, না কোন জলাশয়। পায়ে হেঁটে এত উঁচু পাহাড়ে উঠে লোকের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত। সঙ্গে করে যা জল আনত তাই দিয়ে কোনরকমে তৃষ্ণা দূর করে তারা পূজো সেরে ফিরে যেত।

একবার এই পাহাড়ে শম্ভু ঠাকুরের পূজো করতে এসে মালোজী যাত্রীদের এই কষ্ট দেখেন। দেখেই তাঁর মনে হল, যাত্রীদের কষ্ট দূর করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে পাহাড় খোঁড়ার দল নিযুক্ত হয়ে গেল। শেষে মালোজীর চেষ্টায় সেই শক্ত পাহাড়ের চূড়ায় এক মস্তবড় পুষ্করিণী তৈরি হয়ে যাত্রীদের জলকষ্ট দূর করলে। লোকে মালোজীকে আশীর্বাদ করতে লাগল।

পুষ্করিণী তৈরী শেষ হবার পর একদিন রাত্রে মালোজী ঘুমোচ্ছেন! হঠাৎ তাঁর চোখের সামনেটা এক অদ্ভুত ঠাণ্ডা জ্যোতির আলোয় ভরে গেল। মালোজী আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলেন সেদিকে। আস্তে আস্তে সেই জ্যোতির খানিকটা ঘনীভূত হয়ে একটা মুখ ফুটে উঠল। মালোজী দেখলেন যে, ইনি তাঁর নিত্য আরাধ্য দেবতা, মহাদেব।

মহাদেব হাসিমুখে বললেন, মালোজী, তোমার কাজে আমি খুব খুশী হয়েছি। আমি তোমার বংশে অবতীর্ণ হব। হিন্দু ধার্মিকদের রক্ষা করব। আর সারা দক্ষিণী রাজ্য জয় করে তোমায় দেব।

এমন সময় মালোজীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন, এতক্ষণ তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন। কিন্তু স্বপ্ন হলেও তিনি তা একদিনের জন্যেও অবিশ্বাস করতে পারেননি। তিনি অন্তঃকরণের সঙ্গে বিশ্বাস করতেন যে, তাঁর যা কিছু উন্নতি সবই শিবের কৃপায়।

স্বপ্নের কথা মালোজী বিশ্বাস করলেও তাঁর জীবনে সে স্বপ্ন সফল হল না। হল তাঁর জীবন অবসানের কয়েক বছর পরে। মালোজীর পুত্র শাহজীর প্রথম সন্তান জন্মলাভ করলে। নাম হল শম্ভুজী। শম্ভুজীর জন্মের চার বৎসর পরে শাহজীর দ্বিতীয় পুত্র জন্মায়। তার নাম হল শিবা অর্থাৎ শিবাজী।

এই শিবাই শশীকলার মত বেড়ে উঠে ছত্রপতি শিবাজী নাম নিয়ে কি করে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল, তা অন্য কাহিনী। সময়ান্তরে বলব।

মুর্শিদাবাদ জেলার আওচা নিবাসী শ্রীশশাঙ্কশেখর চ্যাটার্জী, শিবশঙ্কর চ্যাটার্জী, উমাশঙ্কর চ্যাটার্জী ও রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী তাঁদের স্বর্গগতা মাতা বিভাবতী চ্যাটার্জীর পুণ্যস্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রস্তাব করেছেন। তাঁর প্রস্তাব অনুসারে আমরা

৺বিভাবতী চ্যাটার্জী স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা

নামে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা আহ্বান করছি।

প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু :

একটি অপূর্ব অতিথি সৎকার

রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩। প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা আগামী ভাদ্র সংখ্যায় শুকতারায় প্রকাশিত হবে। প্রতিযোগিতার কোনও লেখা ফেরত পাঠান হয় না।

প্রথম পুরস্কার ১৫·০০ টাকা ● **দ্বিতীয় পুরস্কার ১০·০০ টাকা**

"৺বেলারানী স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য়
প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

মরণ যারা করল বরণ

পীযূষকান্তি দত্ত

৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ।

বেলা ১২টা। ইংরেজ সরকারের সুরক্ষিত অফিসগৃহ রাইটার্স বিল্ডিংসের সামনে এসে দাঁড়াল একটি ট্যাক্সি। তা থেকে নেমে এলেন সুদর্শন ও অল্পবয়স্ক তিনজন সামরিক অফিসার—মেজর, ক্যাপ্টেন ও লেফটেন্যান্ট। তাঁদের নিখুঁত স্যুট-বুট-হ্যাট-টাই দেখলে পুরোদস্তুর ইংরেজ ছাড়া আর কিছু মনে হয় না।

দ্বাররক্ষীরা অ্যাটেনশন ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে পথ ছেড়ে দিল অফিসারদের।

কয়েকটা মাত্র মুহূর্ত, সিঁড়ি দিয়ে তাঁদের ওপর তলায় উঠে যেতে যা দেরি। আর তারপরই—দ্রাম্-দ্রাম্-দ্রাম্···একটি দুটি নয়, পর পর ছটি গুলির শব্দে যেন কেঁপে উঠল গোটা রাইটার্স বিল্ডিংসটাই।

ব্যাপার হল এই, নিজের অফিসঘরে জরুরী কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত কর্নেল সিম্পসন—কারা-অধিকর্তা। ব্যক্তিগত সচিব জ্ঞান গুহকে কি সব দায়িত্ব বোঝাচ্ছিলেন তিনি। হঠাৎ মিলিটারী কায়দায় ভারী বুটের শব্দে হতচকিত হয়ে উঠেন উভয়েই, কিন্তু কিছুমাত্র ভেবে ওঠবার আগেই দমকা ঝড়ের মত ক্ষিপ্রগতিতে ঘরে প্রবেশ করলেন তিন অফিসার। সিম্পসনকে লক্ষ্য করে বারেবারে সশব্দে আগুন ছড়ায় তাঁদের রিভলবারগুলো।

'My God' বলে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন কারা-অধিকর্তা। জ্ঞান গুহ আত্মগোপন করলেন। কিন্তু তাকে খোঁজার কোনও চেষ্টাই করলেন না আগন্তুকেরা। মেজর নির্দেশ দিলেন—"About turn! Our next target is Home Secretary Albian Mar".

কিন্তু লক্ষ্যস্থলে যাবার পথে তাঁরা সম্মুখীন হলেন জনৈক কর্মচারীর। ব্যাপার বুঝতে পেরে তিনি চেষ্টা করলেন তাঁদের বাধা দিতে। ফল হাতে-নাতেই পেয়ে গেলেন, পৈতৃক প্রাণটা খোয়াতে হল আগন্তুকদের আগ্নেয়াস্ত্রগুলোর শিকার হয়ে। আর অবাধে এবার এগিয়ে গেলেন হত্যাকারীরা।

রাজস্ব-সচিব মারের ঘরে ঢুকে অগ্নিবর্ষণ করলেন তাঁরা, কিন্তু একটু ভুল হয়েছিল তাঁদের গণনায়, চকিতে মার কোথায় যেন লুকিয়ে পড়ে হয়ে গেলেম অদৃশ্য। তাই স্বয়ং যম যাঁর অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুতপ্রায় হয়েছিলেন, তাঁকেও আর যমপুরীর পথটা দেখিয়ে দেওয়া হল না।

ওদিকে পরপর এতগুলো গুলির শব্দ শুনে উদ্যত রিভলবার হাতে একের পর এক ছুটে এলেন আই. জি. অব্ পুলিস মিঃ ক্রেগ, মিঃ ফোর্ড ও সহকারী আই. জি. জোন্স্। নিজ নিজ অস্ত্রের সদ্ব্যবহার করে অবাঞ্ছিত অতিথিদের মোকাবিলার চেষ্টাও তাঁরা করলেন, কিন্তু তাঁদের শরীরে আঁচটুকুও লাগাতে পারলেন না, বরং পরাজিত হয়ে নিজেরাই রণে ভঙ্গ দিলেন।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত এই ঘটনায় আকস্মিক ভয়াবহতায় সমস্ত বিল্ডিংসটার ওপর নেমে এল এক নিবিড় আতঙ্কের ছায়া। হর্তাকর্তারা পর্যন্ত পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

হাতের কাছেই লালবাজার—পুলিসের সদর দপ্তর। সেখানে বসে খবর পেয়ে গেলেন পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্ট। সঙ্গে সঙ্গে নিজে ঘটনা-স্থলে এসে হাজির হলেন তাঁর সশস্ত্র পুলিস-বাহিনীকে নিয়ে। এলেন ডেপুটি কমিশনার মিঃ গর্ডন ও মিঃ বার্ট। কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দলে দলে মিলিটারীও এল, শুরু হল গুলি বিনিময়।

ফল তথৈবচ। রিভলবার সম্বল তিনজনের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হল অগণিত রাইফেলধারীকে।

কিন্তু নিষ্ক্রিয় রইলেন না বিজয়ীরা। মেজর নির্দেশ দিলেন—"চলো পাশপোর্ট ডিপার্টমেণ্ট।"

চোখের পলকে তিনজন এসে উপস্থিত হলেন নির্দেশিত ঘরে। সঙ্গে সঙ্গে যেন ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন সেখানে কর্মরত সকলে। সুবিধামত জায়গায় আত্মগোপনের চেষ্টাও করলেন। কিন্তু অধিকাংশই ভূলুণ্ঠিত হলেন আগন্তুকদের রিভলবার-গুলোর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

এবার সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে প্রমাদ গণলেন টেগার্ট। বাধ্য হয়ে ডাক দিলেন গুর্খা বাহিনীকে, কারণ সাধারণ পুলিস-মিলিটারীর চেয়ে তারাই বেশী রণদক্ষ।

ওদিকে অফিসারত্রয়ের অতর্কিত আক্রমণে তছনছ হয়ে যেতে লাগল পাশপোর্ট অফিসের যা-কিছু।

গুর্খাবাহিনী এবার তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি নিক্ষেপ করতে লাগল, তবুও অক্ষতদেহে রয়ে গেলেন তিনজনেই।

অতঃপর সূচনা হল ঐতিহাসিক 'অলিন্দ যুদ্ধের' (Verandah Battle)। ঘটেনি যা কোনও দেশের ইতিহাসে, তাই বুঝি ঘটল।

দোতলার বারান্দার একপ্রান্তে হাঁটু মুড়ে পোজিশন নিয়েছে অসংখ্য গুর্খা সৈন্য। সঙ্গে তাদের শক্তিশালী রাইফেল। অপরপ্রান্তে অর্ধশায়িত অবস্থায় প্রস্তুত মাত্র তিনটি যুবক অফিসার। একটি করে অল্প পাল্লার রিভলবার তাঁদের হাতে। এই অবস্থাতেই শুরু হল গুলি-বিনিময়ের পালা।

তবুও অনেকক্ষণ অক্ষতদেহে সমানে যুঝলেন অফিসারেরা। শুধু তাই নয়, গুলি ছুঁড়ে ধরাশায়ী করে ফেললেন জুডিশিয়াল সেক্রেটারী মিঃ নেলসন ও সেক্রেটারী মিঃ ট্যয়নামের মত জাঁদরেল বিপক্ষীয় অফিসারদের।

অবশেষে একসময় বিপক্ষের গুলি বিদ্ধ হল ক্যাপটেনের বাঁ হাতে। কিন্তু কি আশ্চর্য! যন্ত্রণায় এতটুকুও কাতর হলেন না তিনি, বরং হাসতে হাসতে মেজরকে আশ্বাস দিলেন—"চিন্তার কিছু নেই। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। ডান হাত তো ঠিক আছে।"

তারপর হঠাৎ দেখা গেল লেফটেন্যাণ্টের রিভলবারে গুলি একটিও নেই। অপর দুজনের আছে একটি করে। তাঁরা সেগুলো নিজেদের জন্য রাখলেন।

শেষ হল তাঁদের action-এর পালা। পরবর্তী করণীয় হিসাবে তাঁরা আত্মহত্যাই স্থির করলেন, কারণ তাঁদের বিচারে শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ অপেক্ষা আত্মহত্যাই স্বর্গলাভ এবং সেজন্য তাঁরা প্রস্তুতও বটে। দুজনের রিভলবারে দুটি গুলি তো রইলই, পরন্তু প্রত্যেকের পকেটে রয়েছে একটি করে পটাসিয়াম সায়নাইডের অ্যাম্পুল।

যাই হোক, সামনের খালি ঘরটায় ঢুকে পড়লেন তাঁরা। অবশ্য দরজা বন্ধ করার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁদের রিভলবারগুলো শত্রুপক্ষপানে তাক করা রইল।

দরজা বন্ধ করার পর—লেফটেন্যাণ্টকে বললেন

মেজর—"সায়নাইডের পুরিয়া হাতে তুলে নিয়ে প্রস্তুত থাক।" ক্যাপ্টেনকে বললেন—"প্রস্তুত থাক পিস্তল নিয়ে"। আর নিজেও তাই রইলেন। পরমুহূর্তেই হল শেষ নির্দেশ। লেফটেন্যাণ্ট বিষ মুখে নিয়ে এবং মেজর ও ক্যাপ্টেন নিজের নিজের রিভলবারে গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়লেন মেঝেয়।

কিছুক্ষণ তাঁদের কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে এগিয়ে এলেন চার্লস টেগার্ট। এল সশস্ত্র বাহিনীও। সকলের হাতেই উদ্যত অগ্নিনালিকা।

ঘরের দরজা ভেঙ্গে ফেলা হল। সবিস্ময়ে সকলে দেখলেন—লেফটেন্যাণ্টের হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ; বাকী দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মেজরের কপালের দুপাশেই বিঁধেছে গুলি, ক্যাপ্টেনের গলার বাঁদিকে রয়েছে ক্ষতচিহ্ন। শেষোক্ত দুজনও বিষের অ্যাম্পুল মুখে নিয়েছিলেন। কিন্তু গুলির ক্রিয়া তাঁদের সেগুলো দাঁতে কামড়ে ভাঙবার ফুরসুৎ দেয়নি।

সেকথা থাক। মেজর তখনও সজ্ঞানে ছিলেন। টেগার্ট গিয়ে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে—"তোমার নাম কি?"

নির্ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে আত্মপরিচয় দিলেন মেজর। কিন্তু টেগার্টের বারংবার জিজ্ঞাসা সত্ত্বেও সহকারীদের কোনও পরিচয়ই তিনি ফাঁস করলেন না। অবসাদে নিদ্রায় বুঁজলেন চোখ দুটি।

লেফটেন্যাণ্টের মৃতদেহ পাঠানো হল পুলিসী হেফাজতে, আর আহত মেজর ও ক্যাপ্টেনকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

সেখানে পৌঁছবার সময়েও জ্ঞান ছিল মেজরের। সেই সুযোগে কয়েকজন সি. আই. ডি. কর্মচারী তাঁর কাছ থেকে তাঁর ও তাঁর সহকর্মীদের সম্বন্ধে নানা কথা জানতে চান। টেগার্টও স্বয়ং সে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোনও মতেই মুখ খোলেন না মেজর। টেগার্ট এবার ভয় দেখান তাঁকে—"মুখ খোল, নইলে যে হাতে তুমি মিঃ লোম্যানকে হত্যা করেছ, সেই হাত আমি বুটের আঘাতে থেঁতলে দেব।"

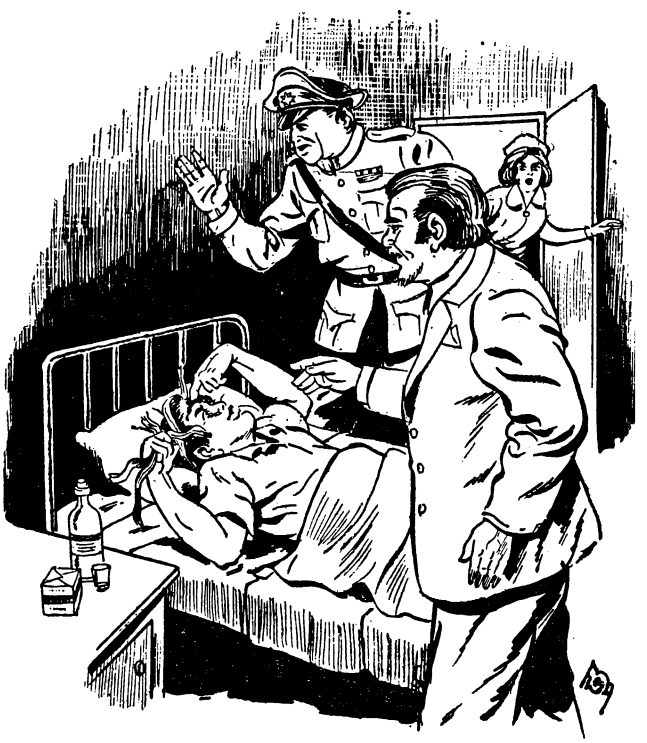

কপালের ব্যাণ্ডেজ সরিয়ে মেজর আঙুল চালিয়ে দিলেন ক্ষতের গভীরে। [পৃষ্ঠা ২২২

এতক্ষণে মেজর আবার সরব হন, সকৌতুকে বলেন—"তোমাদের দশ হাজার টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছি, আর কি চাও?"

না, একটুও মিথ্যে বলেননি তিনি। এই মেজরই ঢাকায় থাকাকালীন হত্যা করেছেন সারা বাংলার আই. জি. অব্ পুলিস মিঃ লোম্যানকে। সেই অপরাধে তাঁর মাথার দাম ধার্য হয়েছিল দশ হাজার টাকা। আর আজ তাঁর আত্মপরিচয় দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই।

কিন্তু পাষাণ-কঠিন মন টেগার্টের। আশানুরূপ উত্তর না পেয়ে এবার সত্যিই মেজরের ডান হাতের

আঙুলগুলো বুটের আঘাতে নিষ্পেষিত করেন। যন্ত্রণায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন অসুস্থ মেজর। তখন টেগার্ট তাঁর বাঁ হাতের ওপরেও সবুট অত্যাচার চালান। তারপরই আবার জনৈক চিকিৎসককে ডেকে আঙুলগুলো ব্যাণ্ডেজ করতে নির্দেশ দেন। কারণ তাঁর বিশ্বাস, এখনও এঁকে সারিয়ে তুলতে পারলে এঁদের দলের খবরাখবর জানার ব্যাপারে অনেকটা সুরাহা হতে পারে।

ক্রমশঃ সুস্থতার দিকে চললেন মেজর ও ক্যাপ্টেন। সরকারের পক্ষে এ এক পরম আনন্দের সংবাদ।

কিন্তু হরিষে বিষাদ ঘটে গেল। হঠাৎ একদিন মেজর করে বসলেন এক মারাত্মক কাণ্ড। কপালের ব্যাণ্ডেজ সরিয়ে আঙুল চালিয়ে দিলেন ক্ষতের গভীরে, এবং ঐ পন্থায় কিভাবে মৃত্যুকে ডেকে আনা যায়, একজন মেডিক্যাল শিক্ষার্থী হিসাবে তিনি তা সুবিদিত। ফলে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুই হয়ে উঠল অবধারিত।

ক্ষত বিষিয়ে উঠল, সঙ্গে এল জ্বর আর বিকার। বিকারের ঘোরে প্রায়ই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন তিনি—পালাচ্ছে, গুলি কর···কুইক, ফরওয়ার্ড মার্চ···

কখনো আপনমনে বলেন—কাওয়ার্ড, কাওয়ার্ড ···আমাকে ফাঁসি দেবে?···মা, তা কখনো হবে না।

ঔষধ-পথ্য সেবনও বন্ধ করে দেন তিনি। যেন প্রয়োপবেশনেই ব্রতী হয়েছেন।

ব্রত হল সফল। মাত্র ক'দিন পরে—১৩ই ডিসেম্বরের সকাল ৬টায় চিরনিদ্রা নেমে এল মেজরের দু'চোখের পাতায়। মৃত্যুকালে সেনাপতি চেষ্টা করলেন ডান হাতটা ওপর পানে তুলতে। বোধ হয় স্যালুট ভঙ্গীতে কপালে হাত ছুঁইয়ে মা-বাবা-দাদা আর অগণিত সহকর্মী-সমমর্মীদের শেষ সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে যাবার জন্যই।

ওদিকে ক্যাপ্টেনও অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন। পুলিস ও সি. আই. ডি. কর্মচারীরা তখন সুকৌশলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাঁর কাছ থেকে দলের নানা খবর জানতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী বিন্দুবিসর্গ কথাও তিনি প্রকাশ করলেন না।

তবে এই গোপনীয়তার শাস্তিও তাঁকে পেতে হল সুদেমূলে। নির্দ্বিধায় মাথা পেতে নিলেন তিনি, কারাদণ্ড। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের কণ্ডেম্‌ণ্ড সেলে বন্দী রইলেন। আর সেসন জজ মিঃ গ্যালকের সভাপতিত্বে চলল তাঁর বিচার-প্রহসন।

দীর্ঘ কয়েক মাস পরে রায় বেরোল। দণ্ডাজ্ঞা হল ফাঁসির। প্রিভি কাউন্সিল সে রায় অনুমোদনও করলেন।

কিন্তু মৃত্যুভীতিকে মনে তিলমাত্রও স্থান দিলেন না ক্যাপ্টেন। বরং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও রবীন্দ্র সাহিত্য চর্চা করে কারাবাসের দিনগুলো কাটিয়ে দিলেন পরমানন্দে। অশ্রুআঁখি জননীকে সান্ত্বনা দিলেন—"মা, এ যে বীরের মৃত্যু···ক'জন ছেলের এমন মরবার ভাগ্য হয়?" এক চিঠিতে লিখলেন—"মৃত্যু মিত্ররূপেই আমার কাছে দেখা দিয়াছে।" বৌদিকে লিখলেন—"মরণকে আমাদের ভয় না করিয়া প্রশান্তচিত্তে বরণ করিয়া লইতে হইবে। মরণকে ভয় করিলে ধর্মের প্রধান সোপানই যে আমরা উত্তীর্ণ হইতে পারিব না!"

মৃত্যুর প্রতি তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বলেই যে কণ্ডেমণ্ড সেলে দু'দিন থাকলেই আধমরা হয়ে যায় বন্দীরা, সেখানে দিনের পর দিন থাকতে থাকতেই তাঁর শরীরের ওজন গেল বেড়ে।

ফাঁসির দিন স্থির হয়েছিল ৭ই জুলাই, ১৯৩১। প্রতিদিনের অভ্যাসমত সেদিনও তিনি প্রত্যূষে উঠে স্নানাদি সারলেন। মধুর কণ্ঠে উচ্চারণ করতে লাগলেন সূর্যমন্ত্র। অঙ্গে তুলে নিলেন ফাঁসির বেশবাস। যেন 'মৃত্যুর গর্জন শুনছে সে সংগীতের মতো'! তারপর সহাস্য বদনে ফাঁসিমঞ্চে গিয়ে উঠলেন, গেয়ে উঠলেন মাতৃমুক্তি যজ্ঞের সেই তেজোগর্ভ মন্ত্র—'বন্দে মাতরম্'।

নির্বাপিত হল আরেকটি জীবন-দীপ। অসংখ্য বন্দী করে উঠল অকুতোভয় ক্যাপ্টেনের জয়ধ্বনি।

কিন্তু কি পরিচয় এই তিন বীর সমরনায়কের?

এঁরা হলেন বিনয়কৃষ্ণ বসু (মেজর), সুধীর ওরফে বাদল গুপ্ত (লেফটেন্যাণ্ট্) ও দীনেশচন্দ্র গুপ্ত (ক্যাপ্টেন)। ঢাকা জেলার পাশাপাশি তিন গ্রামের ছেলে এঁরা। প্রথমজনের বাড়ি সিমুলিয়া গ্রামে, বাকী দুজনের রাউথভোগ ও যশোলং-এ। বয়সে নিতান্তই তরুণ এ তিনজন—যথাক্রমে বাইশ, আঠারো ও কুড়ি বছর বয়স্ক। সংগ্রামের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত এই ভারতসন্তানদের একমাত্র স্বপ্ন ও সাধনাই ছিল মাতৃশৃঙ্খল মোচন।

সাবধান থাকাই ভাল

উড়ে যাওয়া ছোট্ট মেয়েটির নাম মিনি মুডি। বয়স তার দুবছর। এই বয়সে সে একবার মেক্সিকো উপসাগরের ধারে বালির খেলা করছিল। সেই সময়ে খেলার ছলে ৩০টি গ্যাস ফোলান বেলুন মজা দেখবার জন্যে তার কোমরে বেঁধে দেওয়া হল। কেউ বুঝতে পারেনি যে এর ফল বিপদ-জনক হতে পারে। যা হল তা দেখে লোকে ভয়ে গেল গেল বলে চেঁচিয়ে উঠল। অতগুলি গ্যাস বেলুনের টানে মেয়েটি শূন্যে ৫০ ফুট উপরে উঠে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে মেক্সিকো উপসাগরের উপর দিয়ে উড়ে চলল। সকলেই ধরে নিল মেয়েটি এবার গেল।

সেই সময়ে জর্জ মুনি বলে একজন ভদ্রলোক সেখানে ছিল। বন্দুকের টিপ ছিল তাঁর অব্যর্থ। তিনি গুলি করে কয়েকটি বেলুন ফাটিয়ে দিতে, মেয়েটি আস্তে আস্তে সেণ্ট জোসেফ দ্বীপে এসে নামে। সৌভাগ্যের কথা মেয়েটির কোন আঘাত লাগেনি।

মেয়েটির ভাগ্যেও কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু এ ভাগ্য আর কারো না থাকতে পারে। তাই সাবধানে থাকাই ভাল।

রিপ্লে থেকে

হাঁদা ভোঁদার

স্ট্যাম্প অ্যালবাম

কুঁচকে, ভালো চাস তো তোর স্ট্যাম্প অ্যালবামটা আমায় দিয়ে দে। না হলে---
ঠি-ঠিক আছে, হাঁদা, এই নে।
পরদিন স্কুলে
ভোঁদার অ্যালবাম খুব চমৎকার!
হেঃ হেঃ! আমার অ্যালবামের গাদা এখনো দেখেন নি! গতকাল আমি আরো কয়েকজনের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি!
সাবাশ! দারুণ সংগ্রহ! হাঁদাই পুরস্কার বিজয়ী!
পরদিন সকালে টকুবাবুর বাড়িতে
এই সব দুর্লভ স্ট্যাম্প আঁটতে আমাকে সাহায্য করবে, এই হচ্ছে পুরস্কার হাঁদা!
অ্যাঁ! এই পুরস্কার?
ওরে বাবারে! এখনও আদ্ধেক হয়নি রে উল্লস!
বিকেলে
অধ্যাপক টকুবাবু তোকে কি পুরস্কার দিলেন দেখা না রে হাঁদা!

"৺বেলারানী স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য়
দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

একটি নির্ভীক মেয়ের বীরত্বের কাহিনী

বিশ্বন মিত্র

সন্ধ্যার আঁধার তখনো চারদিক আচ্ছন্ন করেনি। পাখিরা নীড়ে ফেরার তোড়জোড় শুরু করেছে। গাছগুলোর মাথায় দিনশেষের ক্ষীণ আলো তখনো লেগে আছে। সীমান্তবর্তী এক গ্রামে থাকে মীরা নামে মেয়েটি। সে দূর থেকে দেখল শকুনের ভিড় জমেছে। গাছগুলো শকুনে যেন ঢাকা পড়ে গেছে।

মীরার কৌতূহল হল। সে পায় পায় এগিয়ে গেল। সবিস্ময়ে সে দেখল একটি সৈনিক আহত হয়ে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে একটু আধটু নড়চে। শেষ অবস্থা, চেষ্টা করলে বাঁচানো যেতেও পারে। নার্সিং ট্রেনিং তো তার নেওয়াই আছে। এখন শুধু চাকরির অপেক্ষা। একা সে কাঁধে করে নিয়ে যেতে পারবে না। বিরাট দশাসই চেহারা। মীরা তখনই ছুটল আরো দু'চারজনকে ডাকতে, যাদের সাহায্যে সে তার নিজের ঘরে সৈনিককে তুলে সেবা-শুশ্রূষা করতে পারে।

সব বৃত্তান্ত শোনার পর কেউ তার সঙ্গে আসতে রাজী হল না। মীরা প্রথমে একটু দমে গেল। ভর সন্ধ্যেবেলা সীমান্তে যখন উভয়পক্ষে গুলি বিনিময় চলছে তখন তার মত মেয়ের পক্ষে একা যাওয়া কি ঠিক হবে! পরক্ষণেই ভাবল, আরে জীবনটা তো ক্ষণিকের। এ তো চিরদিনের নয়। একদিন না একদিন তো মরতেই হবে। কাজেই ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে ভীরুর মত বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না। এখনো পর্যন্ত তো কারোর উপকারে লাগতে পারলাম না। সীমান্তে যুদ্ধ চলছে সমানে। তা আজ দিন চার পাঁচ হয়ে গেল। অঘোষিত যুদ্ধ। কোন পক্ষই সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করছে না। অথচ রোজ মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কত সৈনিক সময়মত সেবা-শুশ্রূষার অভাবে নিশ্চয় অকালে প্রাণত্যাগ করছে। তবে তো তাদের সৈন্যসংখ্যা ধীরে ধীরে কমে আসছে! বিপদের কথা।

মীরা ভাবল, এ ব্যাপারে সে আহত সৈনিকদের সেবা-শুশ্রূষার দ্বারা সারিয়ে তুলে দেশকে সাহায্য করতে পারে। সেরে ওঠার পর সৈনিকরা আবার যুদ্ধে এগিয়ে যেতে পারবে শত্রুর মোকাবিলা করতে।

এক চাষীর কাছ থেকে গরুর গাড়ি চেয়ে নিল মীরা। নিজেই সে চালিয়ে নিয়ে গেল আহত সৈনিকের কাছে। সঙ্গে আলো নেয়নি। কেন না যুদ্ধের সময় খোলা স্থানে আলো জ্বালানো নিষিদ্ধ। অন্ধকারে চারদিক ঢেকে গেছে। গাছপালাগুলো পাশাপাশি ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে। মীরার গা একটুও ছমছম করল না। ভয়কে সে বিন্দুমাত্র আমল দিল না। অন্ধকারের মধ্যেই সে খুঁজে বার করল সেই আহত সৈনিককে। অনেক কষ্টে টেনে তুলল তাকে গরুর গাড়িতে। মীরার মনে হল, অদূরে যেন গোলা এসে পড়ল। আগুনের হলকা পলকে মিলিয়ে

গেল। পরক্ষণেই আহত সৈনিকের মৃত্যুযন্ত্রণা তার কানে এসে লাগল। মৃত্যুকে তুচ্ছ করে এরা যখন নিঃস্বার্থভাবে দেশরক্ষার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তখন সে-ও কেন তা পারবে না। তাকেও এই বিপদের দিনে এদের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। এজন্যে যদি তার জীবন বিপন্ন হয়, হোক।

গ্রামের চার পাঁচটি মেয়ের সহায়তায় মীরা আহত সৈনিকদের সেবা-শুশ্রূষা শুরু করে দিল। অবশ্য সীমান্ত থেকে আহত সৈনিকদের নিয়ে আসার ভার মীরার। সে ব্যাপারে কেউ ওর সঙ্গী হয় না। যা হোক মীরার আন্তরিক চেষ্টায় মাত্র দু'দিনের মধ্যেই দশ বার জন সৈনিক সুস্থ হয়ে আবার কর্মস্থলে ফিরে যেতে সক্ষম হল। প্রত্যেক সৈনিক যাবার আগে বলল—তুমি আগের জন্মে আমার বোন ছিলে নিশ্চয়ই। নইলে তোমার সেবা-যত্নের মধ্যে বোনের ছোঁয়া পেলাম কি করে! এজন্মে তাই ঈশ্বর আবার আমাদের দেখাসাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিলেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার মত বোন যেন জন্মে জন্মে পাই।

মীরা বলল—আমার বাবাও সৈনিক ছিলেন। শুনেছি যুদ্ধক্ষেত্রেই তিনি প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। বাবার সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁরাই মাকে জানিয়েছেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হবার পর তাঁরা দিন তিনেক বেঁচে ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন সাহায্যই মেলেনি। বুলেটবিদ্ধ অবস্থায় মানুষ আর কত দিন বাঁচতে পারে বলুন। বাবার কষ্টের সেই দিনগুলো যেন এখনো চোখের সামনে ভাসে। কি করে আপনাদের ভুলি বলুন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আপনারা দেশরক্ষার কাজে যেন জয়ী হতে পারেন। আপনাদের সঙ্গে যেতে পারব না, কারণ সে যোগ্যতা আমি অর্জন করিনি। কিন্তু মন আমার সর্বক্ষণ আপনাদের সঙ্গে থাকবে। আপনাদের প্রত্যেকের ঠিকানা আমি লিখে রেখেছি, সময়মত আপনাদের বাড়ির ঠিকানায় চিঠি লিখে দেব।

কি করে যেন শত্রুশিবিরে খবর পৌঁছে গেছে, মীরার অসাধারণ কৃতিত্বের কথা। শুধু তাই নয়, মীরার সেবা-শুশ্রূষার গুণে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে নতুন করে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। ফলে তারা দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে শত্রুপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

কাজেই এ মেয়েকে যতদিন না পৃথিবী থেকে সরানো যাবে, ততদিন শত্রুপক্ষকে কায়দা করা সম্ভব হবে না। শত্রুসৈন্যরা প্ল্যান করল গোপনে। রাতের অন্ধকারে সাধারণ গৃহস্থ মানুষের ছদ্মবেশ নিয়ে ক'জন শত্রুসৈন্য বেরিয়ে পড়ল। গ্রামটির ম্যাপ পর্যন্ত তারা এঁকে ফেলেছিল। তবু রাতের অন্ধকারে শত্রুসৈন্যের নজর এড়িয়ে গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পৌঁছান কম কঠিন কাজ নয়। আপন দেশের জন্য তারাও মরিয়া। কেমন করে যে তারা মীরার গ্রামে এসে পৌঁছল তা একমাত্র তারাই জানে।

কিন্তু তাদের মুশকিল হল ঐ সীমান্তবর্তী গ্রামে পৌঁছে। কোন্ কুটিরে মেয়েটি থাকে তা তো তারা জানে না! এখানে তো অনেক কুঁড়ে ঘর, পাকা ঘর দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কোন্ ঘরে সে থাকে! তাড়াতাড়ি খুঁজে বার করে কাজ হাসিল করে ফিরে যেতে হবে। নইলে তো ধরা পড়ে প্রাণটি এধারে রেখে যেতে হবে। গ্রামটা বেড় দিয়ে তারা সাধারণ মানুষের পোশাকে পাক খাচ্ছে শুধু। প্রত্যেকেই চাদর মুড়ি দিয়ে অতি দীন দরিদ্রের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। দেখলে মনে হবে কোন বাড়ির কুটুম। নির্দিষ্ট বাড়িটি রাতের অন্ধকারে খুঁজে না পেয়ে ঘুরেই মরছে। সাহস করে জিগ্যেসও করতে পারছে না গ্রামের কোন

মীরা দেখে চারজন চাদর মুড়ি দেওয়া লোক সামনে দাঁড়িয়ে।

লোককে। কে জানে তাতে হিতে বিপরীতও হতে পারে। যত রাত বাড়ছে, তাদের ছটফটানিও তত বাড়ছে। মরীয়া হয়ে তারা শেষে যে কুটিরের সামনে এসে দরজায় নক করল সেটাতেই মীরা থাকে। সবে সে খেয়ে উঠেছে। আর একটু পরে রাতের আঁধারে তার কাজ শুরু হবে। গরুর গাড়ি করে একাই সে আহত সৈন্য বয়ে আনবে চিকিৎসার জন্যে। তারপর সারারাত ধরে প্রাথমিক চিকিৎসা ও নার্সিং চলবে। সত্যি বলতে, মীরার কাছে অভিজ্ঞ ডাক্তারও হার মানতে বাধ্য হবে!

দরজা খুলে মীরা দেখে চারজন চাদর মুড়ি দেওয়া লোক সামনে দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে তারা আমতা আমতা করতে থাকে। মীরা আগন্তুকদের কু-মতলব সম্বন্ধে কিছুই জানে না। সে সহজ সরল প্রাণখোলা মেয়ে। কপটতা কাকে বলে তাই তার অজানা। কিন্তু সে বুদ্ধিমতী মেয়ে। সরল হলেও বুদ্ধির মাপকাঠিতে সে অনেকের উপরে। শুধু তাই নয়, সব কাজেই সে ধীর স্থির। আর কোন ব্যাপারেই সে ঘাবড়ে যায় না। আগন্তুকদের ইতস্ততঃ করতে দেখে মীরাই মুখ খুলল—আপনারা কি চান এত রাত্রে?

মীরার প্রশ্নে তারা প্রথমে ভড়কে গেলেও সামলে নেয়। ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না এমন মুখের ভাব করে বলল—একজন,—দেখুন আমরা যাঁর কাছে এসেছিলাম তিনি নাকি দিন দুই আগে কি যেন কাজে ফ্যামিলি নিয়ে চলে গেছেন। কোথায় রাত কাটাব বুঝতে পারছি না। এখানে কোন হোটেল টোটেল পাওয়া যাবে কি?

মীরা সরল মনেই বলল—তারই জন্য এত চিন্তার কি আছে? একটা রাতের তো মামলা। যদি ইচ্ছে করেন তো আমার এই কুটিরে রাতটুকু কাটিয়ে যেতে পারেন। আর খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে এটুকু বলতে পারি যে, অভুক্ত থাকতে হবে না।

মীরার আদর-আপ্যায়নে ওরা তো তাজ্জব। ভাবতেই পারেনি, এপারে এসেও এমন আস্তানা মিলবে। কিন্তু যে কাজের জন্য তারা এসেছে সেই কাজই এখনো কিছুই হল না। দুঃখের বিষয় সারা গ্রাম তন্ন তন্ন করে ঘুরেও মীরা নামে মেয়েটির দেখা পাওয়া গেল না। কাল ফিরে গিয়ে তারা কি জবাব দেবে! যে করেই হোক্ আজ রাতের মধ্যে কাজ হাসিল করতে হবে। মেয়েটির তুলনা হয় না। এত রাতে স্টোভ ধরিয়ে তাদের রান্না করে খাওয়াল। যেমন দেখতে, হাতের রান্নাও অপূর্ব। আচ্ছা এ-ও তো বলছে তার নাম মীরা! তবে কি যাকে তারা খুঁজছে সে-ই এই মেয়েটি? তারা

ফিসফাস করে পরামর্শ করে নিজেদের মধ্যে—ঘুমোলে চলবে না। একে অনুসরণ করতে হবে।

আর একজন বলল—সবই তো বুঝলাম কিন্তু সারাদিন এবং রাত ন'টা দশটা পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে শরীর ভীষণ ক্লান্ত, এর মধ্যেই হাই উঠতে আরম্ভ করেছে। ঘুম যেন মেল ট্রেনের মত চলে আসছে।

আর একজন বলল—এই বর্মা চুরুট নে দেখি সবাই একটা করে, ঘুম পালাতে পথ পাবে না। এখানে কি আমরা আরাম করতে এসেছি? যাক গে ঘাপটি মেরে পড়ে থাক। দেখি কি করে মেয়েটি।

আর একজন আপসোস করে বলল—অল্পবয়সী এমন সুন্দরী মেয়ে বিয়ে থা করে কোথায় বৌ হয়ে সিনেমা থিয়েটার দেখবে, দার্জিলিং, সিমলা, পুরী, কোনারক ঘুরে বেড়াবে, তা না যুদ্ধের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছে। যেন সমস্ত দেশ রক্ষার দায়িত্ব ওর কাঁধে। আমাদের ঘরের বৌ মেয়েদের দেখ, আর একে দেখ, কত তফাৎ। এর মত অসাধারণ মেয়ে আমি আর দেখিনি ভাই।

রাত তখন গভীর। নিশুতি রাতে দুড়ুম দাড়াম শব্দ শুধু কানে আসছে। শত্রুসৈনিকদের চারজনের মধ্যে দুজনের নাক ডাকছে। আর দুজন জেগে থাকার জন্য চোখ ডলছে। মীরা বুদ্ধিমতী মেয়ে। এই ক'দিনে সে সৈনিকদের কাছ থেকে রাইফেল ছোঁড়া শিখে নিয়েছিল প্রয়োজনে কাজে লাগবে বলে। আজ সে ওদেরই দেওয়া একটা রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে আহত সৈনিকদের আনতে চলল। অন্ধকারে পথ চিনে যাওয়াই মুশকিল। জোনাকিগুলো এখন আঁধার দিনে তাকে আলো দেখাচ্ছে। আজ যেন তার মন থেকে থেকে বিপদ আশঙ্কা করছে।

মীরা বেরিয়ে যাবার পর দুজন বাকী দুজনকে ডেকে তুলল। তারাও প্রস্তুত হয়ে আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে বেরোল। একজন বলল—এটুকু সময়ের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল! বড় তাজ্জব ব্যাপার তো! পাখি হাতের মধ্যে এসেও উড়ে যাবে তা কখনোই হতে দেব না। যেমন করেই হোক খুঁজে বার করতেই হবে। ওদের কাছে টর্চ আছে পাঁচ ছয় ব্যাটারীর। টর্চের আলোয় মীরার সন্ধান তারা পেয়ে গেল। তারা ভেবেছিল, কোন কষ্টই করতে হবে না। অতি সহজেই ধরে নিয়ে যেতে পারবে। তারা গরুর গাড়ি আচমকা ঘিরে ধরতে মীরা ভূত দেখার মত চমকে উঠল—আপনারা কি চান?

গম্ভীর জবাব—সঙ্গে যেতে হবে।

মীরা বলল—ও, বুঝেছি আপনারা আমার সেই চারজন অতিথি। চমৎকার প্রতিদান। চোখের পলকে মীরা রাইফেল তুলে ট্রিগার টিপল। তিনজন কাটা কলাগাছের মত ভূমিশয্যা গ্রহণ করল। বাকী একজন বুদ্ধি করে শুয়ে পড়েছিল। সে-ই পিছন দিক থেকে রিভলভার চালাল। মীরা গরুর গাড়ির উপর ঢলে পড়ল। সকালে সবাই সবিস্ময়ে দেখল মর্মান্তিক দৃশ্য। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সে ভয় পায়নি। শেষ নিশ্বাস না বেরোন পর্যন্ত মীরা বীরের মত শত্রুসৈন্যের সঙ্গে লড়াই করে গেছে।

ভুতুড়ে প্রাসাদ

নিরঞ্জন সিংহ

শ্বেত পাথরের সুন্দর কারুকার্য করা তিন তলা পুরানো রাজপ্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়ালো দশ বছরের জিম তার বাবার হাত ধরে। সামনের গাড়িবারান্দা থেকে চারচারটে লম্বা থাম উঠে গেছে দোতলার ছাদ পর্যন্ত। সামনে বুনো ফুলের বাগান। জিম অবাক্ হয়ে দেখতে লাগল প্রাসাদটা। বাড়িটায় কোন মানুষজন আছে বলে মনে হচ্ছে না। সব দরজা জানালা বন্ধ। কোথাও একটু আলোর চিহ্ন নেই। অথচ কিছুক্ষণ আগে সন্ধ্যা নেমেছে। জিমের গা'টা কেমন যেন ছমছম করে উঠলো। বাবা বললেন—চলো, এবার ভিতরে ঢুকতে হবে।

জিম কোন কথা না বলে বাবার হাত ধরে একটু ভয়ে ভয়ে প্রাসাদের প্রধান দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। দরজাটা একটু ঠেলতেই খুলে গেলো। বাবা জিমকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। সামনে বিরাট হলঘর। হলের মাঝখানের ছাদে ঝোলানো পুরানো আমলের ঝাড়লণ্ঠন। ওটা জ্বলছে। একটা ফিকে নীল রঙের আলো ছড়িয়ে পড়েছে সারা হলে। জিমরা ঢুকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওদের পিছনের বিরাট ভারী কাঠের পাল্লাটা কঁ্যাচ কোঁচ শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেলো। জিম ভয়ে ভয়ে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে বাবার হাত আরো শক্ত করে চেপে ধরলো। হঠাৎ কতকগুলো চামচিকে ছুটে এলো কোথা থেকে, তারপর চক্রাকারে ঘুরে বেড়াতে লাগল সারা হলঘর জুড়ে। জিমরা একটা দেওয়ালের পাশে সরে এলো। নাহলে হয়ত চামচিকেগুলো ওদের মুখের ওপর আছড়ে পড়তো।

দেওয়ালের দিকে তাকাতে একটু চমকে উঠলো

জিম। দেওয়ালে টাঙানো বিরাট বিরাট অয়েল-পেন্টিং। বোধহয় এ প্রাসাদের যারা মালিক ছিল তাদেরই বংশপরম্পরার ছবি। বাপ রে কি বিরাট আর জাঁকজমকওলা পোশাকপরা ছবি! ভাবলো জিম। মনে হচ্ছে ছবির বদলে সত্যি-কারের মানুষগুলো দেওয়ালের গায়ে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ঠিক তখুনি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো জিম। বাবার হাত ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি ও নিজের চোখ দুটো রগড়ে নিলো। তারপর আবার সামনের ছবিটার দিকে তাকালো। না, চোখের ভুল না মোটেও। জ্যান্ত মানুষের চোখের পাতার মত চোখের পাতা পড়ছে ছবিটার। তাড়াতাড়ি জিম বাবার হাত চেপে ধরলো। কিছু একটা বলতেও যাচ্ছিলো, কিন্তু তক্ষুণি আবার বোধ-হয় একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে গেলো। ওর চোখের সামনে গোটা ছবিটা হঠাৎ মুছে গেলো। জমকালো পোশাকপরা ছবিটার বদলে সেখানে এবার ফুটে উঠলো হোঁদল কুতকুতে মুখওলা একটা মানুষের ছবি। লোকটার পেটটা আর মাথাটা বেঢপ মোটা। মাথা ভর্তি টাক। বেঁটে বেঁটে গোদা গোদা পা। যেন কোন কার্টুন ছবি। এ যে ভূতুড়ে ব্যাপার! মনে মনে ভাবলো জিম। আর কোনদিকে না তাকিয়ে বাবাকে টানতে টানতে এগিয়ে চললো ও পাশের দরজার দিকে।

দরজা খুলতেই সামনে পড়লো বিরাট লম্বা একটা করিডোর। আবছা আলোয় ভরে রয়েছে করিডোর। বাইরের দিকে বিরাট বিরাট রঙীন কাঁচের বন্ধ জানলা। আর ভিতরের দিকে সার সার বড় বড় কাঠের কারুকার্য করা বন্ধ দরজা। একটু এগুতেই জিম আবার চমকে উঠলো পিলে চমকানো বাজ পড়ার শব্দে। কাছেই কোথাও বোধহয় বাজ পড়লো। বন্ধ কাচের জানলা ভেদ করে হঠাৎ ঝলসে উঠতে লাগলো বিদ্যুতের আলো। জানলার দিকে তাকাতে জিম স্পষ্ট দেখতে পেলো, আকাশ চিরে সাপের জিভের মত বিদ্যুতের রেখা একদিক থেকে আর একদিকে চলে যাচ্ছে লকলক করে। জানলার বাইরের বুনো ফুলের বাগান আলোকিত হয়ে উঠছে সেই চমকে। তার সঙ্গে মেঘের গুরু গুরু ডাক। আশ্চর্য ব্যাপার ভাবলো জিম। এই তো ক' মিনিট আগে ওরা প্রাসাদে ঢুকেছে। তখন তো আকাশের অবস্থা ভাল ছিল। ঝড়বৃষ্টির কোন আভাষও ছিল না। এই প্রচণ্ড দুর্যোগে ওরা বাড়ি ফিরবে কি করে?

বিদ্যুতের আলো পড়ে করিডোরটা মাঝে মাঝে ঝলসে উঠছে। বাবা আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছেন। বাধ্য হয়ে জিমও চলেছে। ভিতরের দিকে নজর পড়তেই জিম আবার চমকে উঠলো। দরজার কারুকার্যগুলো এতক্ষণ ও ভালোভাবে লক্ষ্য করেনি কিন্তু বিদ্যুতের আলোয় সেগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হলো জিম। কি বিদকুটে মুখের ছবি সব! একমাত্র দুঃস্বপ্নেই যাদের দেখা পাওয়া যায়। বাবা ওই রকম একটা দরজা খুলে জিমকে নিয়ে ঢুকে পড়লেন। জিম স্পষ্ট বুঝতে পারল ওরা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের উজ্জ্বল আলো কমতে শুরু করলো। বিকেলের আলো যেমন কমতে কমতে সন্ধ্যার অন্ধকারে মিশে যায়, এ ঘরের আলো আস্তে আস্তে কমে প্রায় সন্ধ্যার মত অন্ধকার হয়ে এলো।

হঠাৎ জিমের কানে এলো পিয়ানোর মিষ্টি কিন্তু অদ্ভুত একটা সুর। এরকম অদ্ভুত সুরে কে এখানে পিয়ানো বাজাচ্ছে? ভয়ের বদলে এবার জিমের মনে জাগলো কৌতূহল। ও বাবার হাত ধরে টানতে টানতে এগিয়ে গেলো। থামের

আড়ালে পিয়ানো বাদককে দেখে কিন্তু ও আঁতকে উঠলো। বেঁটে মত একটা লোক ঢোলা পোশাক আর লম্বা টুপি পরে ওদের দিকে পিছন ফিরে পিয়ানোর রিডে হাত বুলিয়ে চলেছে আপন মনে। লোকটা পিছন ফিরে থাকায় জিম ওর মুখ দেখতে পেলো না। পিয়ানো আর লোকটার উপর কোথা থেকে এসে পড়েছে হালকা সবুজ আলো। কিন্তু সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার, লোকটার দেহটা কাঁচের মত সম্পূর্ণ স্বচ্ছ! জিমের মনে হলো মানুষটা অশরীরী।

তবে কি ওরা একটা ভূতুড়ে প্রাসাদে প্রবেশ করেছে সত্যি সত্যি! এবার সত্যি ভয় পেলো জিম। বাবাকে কি যেন বলতে গেলো ও, কিন্তু বাবা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে শব্দ করলেন শ—শ—স্। অর্থাৎ এখন কোন কথা বোলো না।

জিম কিন্তু ওখানে দাঁড়াতে আর ভরসা পেলো না। বাবাকে টানতে টানতে অন্ধকারে কোন রকমে ঠাউর করে সামনের একটা দরজা খুলে ঢুকে পড়লো আর একটা ঘরে। এটা একটা বিরাট হল। এক তলায় কোন ছাদ নেই। দোতলায় ব্যালকনি। এ ঘরে আলো আছে। খুব বেশী উজ্জ্বল না হলেও সব কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঘরটা দেখেই বুঝতে পারলো জিম যে, এটা একটা বল-নাচের হল। একতলার মেঝেয় নাচ হয় আর উপরের ব্যালকনিতে বসে দেখে সবাই।

হঠাৎ জিমের অবাক্ দৃষ্টির সামনে ফাঁকা মেঝেয় কোথা থেকে জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়ে এসে বল নাচ শুরু করলো। বেজে উঠলো নাচের বাজনা। কি সুন্দর ওদের পোশাক! কিন্তু সেই পোশাকের ভিতর থেকে বোঝা যাচ্ছে ওদের দেহের স্বচ্ছতা। অর্থাৎ এরাও মানুষ না। বল নাচটা কিন্তু ভালই লাগলো জিমের কাছে। নাচ শেষ হতেই বাজনা থেমে গেলো আর নাচিয়েরা অদৃশ্য হয়ে গেলো ভোজবাজির মত।

ওখান থেকে বেরুলো ওরা। সামনে বড় বারান্দা। উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। সামনে এ প্রাসাদের কোন পূর্বপুরুষের মর্মরমূর্তি। জিম মূর্তিটার দিকে তাকালো। কি সুন্দর বীরের মত চেহারা। কিন্তু ওকি! হঠাৎ মূর্তিটার চেহারাটা পালটে গেলো! দাঁত বেরুনো তোবড়ানো মুখ। পোশাক আর শরীর হয়ে গেলো কাঁচের মত স্বচ্ছ। ভূতুড়ে স্ট্যাচু। কিছু ভাল করে বোঝার আগেই সেই ভূতুড়ে স্ট্যাচুটা ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে হাওয়ায় মিশে গেলো। একি সাংঘাতিক ব্যাপার রে বাবা!

এবার অন্য ঘরে ঢুকলো ওরা। ঠাণ্ডা স্যাঁতসেতে ঘর। ভূতুড়ে সবুজ আলোর নীচে হাজারো স্বচ্ছদেহী ভূত। মাথার উপর কালো বাদুড়ের ডানাঝটপটানি। বিচিত্র শব্দ, অদ্ভুত চিৎকার। রীতিমত ভয় ধরে যায়। অবশেষে কবরখানার ভূতদের সঙ্গে মোলাকাৎ করে জিম বাবার হাত ধরে ভূতুড়ে প্রাসাদের বাইরে এসে পৌঁছুলো। ভয়ে উত্তেজনায় ওর সারা শরীর তখন থরথর করে কাঁপছে। বাবা বুঝতে পেরে সাহস দিয়ে বললেন —আর ভয় কি জিম, আমরা প্রাসাদের বাইরে এসে পড়েছি।

—বাবা, আর একবার ঢুকবো ওই প্রাসাদে। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো জিম।

বাবা একটু হেসে বললেন—ঠিক আছে, আর একদিন এলেই হবে।

হ্যাঁ, এরকম ভূতুড়ে প্রাসাদে শুধু জিম কেন পৃথিবীর সব ছেলেমেয়েরাই বার বার ঢুকতে চাইবে। যে ভূত কিম্ভূতকিমাকার চেহারা নিয়ে ভয় দেখায় না, বরং নানা রকম মজার কাণ্ড-কারখানা ঘটিয়ে উত্তেজনা আর শিহরন জাগায়,

সেরকম ভূতদের বার বার দেখতে তো ইচ্ছে করবেই। কি, তোমাদের করছে না?

আসলে এই ভূতুড়ে প্রাসাদের ভূত আর তাদের কাণ্ডকারখানার সৃষ্টিকর্তা হচ্ছে মানুষ। বাবা মায়ের সঙ্গে ইংরেজী সিনেমা দেখতে গিয়ে তোমরা অনেকেই নিশ্চয় মিকি মাউসের কার্টুন ছবি দেখে হেসে লুটোপুটি খেয়েছ। এই মিকি মাউসের সৃষ্টিকর্তার নাম হচ্ছে ওয়াল্ট ডিজনী।

ওয়াল্ট ডিজনী ছোটদের ভীষণ ভালবাসতেন। আর সারা জীবন ধরে চেষ্টা করেছেন ছোটদের জন্যে সত্যিকারের কিছু করে যাওয়ার।

সেই চেষ্টার ফলশ্রুতি হচ্ছে ডিজনীল্যাণ্ড। সে এক রূপকথার রাজ্য। এই ডিজনীল্যাণ্ডে দেখা পাওয়া যাবে প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসরদের। দলে দলে এরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। একে অন্যের গায়ে মুখ ঘষছে। ঘুরে বেড়াচ্ছে ভালুক। মধুর সুরে গান গাইছে নানা রকমের পাখি। আর আব্রাহাম লিঙ্কন স্বাধীনতার উপর দশ মিনিট ধরে বক্তৃতা দিচ্ছেন ডিজনীল্যাণ্ডের টাউন স্কোয়ারের এক থিয়েটারে ঠিক জীবন্ত মানুষের মত। তা ছাড়াও আছে হাজারো মজার জিনিস। আর এসব কিছু চালানো হয় যন্ত্রে। ভাবতেও অবাক্ লাগে তাই না? এই ভূতুড়ে রাজপ্রাসাদ হচ্ছে ডিজনীল্যাণ্ডের তিপ্পান্ন নম্বর অ্যাডভেঞ্চার।

তোমাদের নিশ্চয় জানতে ইচ্ছে করছে এরকম ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা কি করে চালানো হয়, তাই না? ডিজনীল্যাণ্ডের কোন টেকনিসিয়ানকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি একটু হেসে বলবেন— আমাদের আবিষ্কৃত অডিও-অ্যানিমেট্রনিকস্ ও

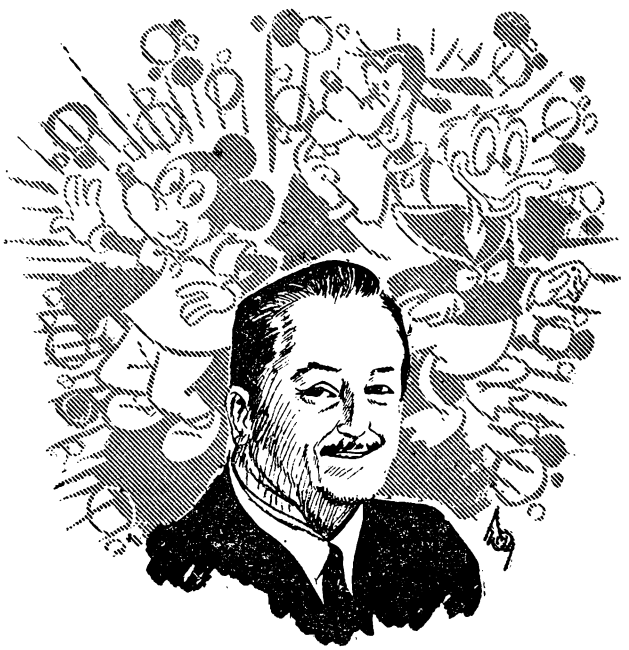

এই মিকি মা[redacted]সৃষ্টিকর্তার নাম হচ্ছে ওয়াল্ট ডিজনী

তার সঙ্গে ছা[redacted]য়া সৃষ্টিকারী কিছু যন্ত্র, টেপ রেকর্ডার ও আরো নানা আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ওই ভূতুড়ে প্রাসাদের কাণ্ডকারখানাকে চালানো হয়। ওয়াল্ট ডিজনী নিজে এই ভূতুড়ে প্রাসাদের পরিকল্পনা করেন। প্রায় দশ বছরেরও বেশী সময় লেগেছিল ডিজনীল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীদের এই ভূতুড়ে প্রাসাদের সব কাজ শেষ করতে। তোমরা শুনে হয়ত দুঃখ পাবে যে, এই শিশুপ্রেমিক মানুষটি ১৯৬৬ সালে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন স্বর্গে।

আমাদের দেশে যদি এমন একজন ডিজনী জন্মগ্রহণ করতেন, তাহলে আমরাও পেতাম একটা রূপকথার জগতের সঙ্গে ভূতুড়ে প্রাসাদ। কি মজাই না হতো তাহলে।

নতুন ধাঁধা

১। সবটাতে থাকিস
অথবা কেটে নিস।
—উত্তমকুমার বটব্যাল, মালিয়াড়া, বাঁকুড়া।

২। খাবার নয় তবু খায়,
পেট কাটলে অল্প পায়,
মাথা ছাড়া হয় সমান,
যে বলে সে বুদ্ধিমান।
—শ্রীকান্ত মাহাত, কোকপাড়া, সিংভূম।

৩। আগাগোড়া শুনতে ভালো
দেহ ছাড়াই মানুষ হলো।
—সিতাংশু মণ্ডল, মটুকবনী, বাঁকুড়া।

[redacted] ফাল্গুন সংখ্যার ধাঁধার উত্তর

১। আশিস ২। আয়না ৩। (ছত্রপতি) শিবাজী

গত ফাল্গুন সংখ্যার ধাঁধার নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম

কলিকাতা—অনিমা, হেমন্ত ও প্রভঞ্জন সরকার—পাটোয়ার বাগান লেন; মনুয়া, ছোটন, সোনামণি প্রভৃতি—গোবরা রোড; ববলি, কাকলী, সোনালী, মিষ্টু প্রভৃতি—পূর্ব সিঁথি রোড; মীরা, অরুণ, গোপলু ও সঞ্জিত দত্ত—শিয়ালদহ; রবীনদা, অরুণাভ ও তির্যক—মোহনলাভ স্ট্রীট; সুনু, রুণু, বুড়ু, মা, বাবা প্রভৃতি—আলিপুর রোড; কুণাল, টুপি, হোচি, সুদীপ প্রভৃতি—টালা; প্রশান্ত, সৌম্য, সুমিত্র, সুধন্য ও কুমকুম—লেক রোড; অলক ও সুমিতা লেক গার্ডেন্স; দীপা ও স্বাতী—নন্দননগর; পরেশ, সন্তোষ, অমল ও সন্দীপ রায়—জামির লেন; বাবা, মা, জয়ন্ত, দেবব্রত প্রভৃতি—গোকুলবাবুর বাজার; মঞ্জুশ্রী ব্যানার্জী, অলোকরঞ্জন সরকার—পাটোয়ার বাগান লেন; সোনালী, কাকলী ও ইলা বসু—বেহালা; মা, পবিত্র, প্রশান্ত ও লক্ষ্মী ভট্টাচার্য—দমদম রোড; প্রদোষ কুমার ও নন্দদুলাল দাস—প্রতাপ চ্যাটার্জী লেন; বাবুরাম, মানু ও অজয় মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা-৩৬; রণবীর, সাধনা ও নির্মল—রামগড়; শোভেন্দ্র, সৌমেন্দ্র, ব্রতীন্দ্র, দিব্যেন্দু ও স্বাতী—বেণীনন্দন স্ট্রীট; দেবু, বিশ্বনাথ, নন্দিতা ও রামকমল মুখার্জী—মেডিক্যাল কলেজ হস্টেল; টুম্পা দাস—আমহার্স্ট স্ট্রীট; শর্বরী রায়—আশুনাথ সাহা রোড; ঝন্টু, মন্টু, শ্রাবণী, সন্টু ও বুড়ি—?; মামুন, সুমুন, কণাদি, মা ও বাবা—রাজা মণীন্দ্র রোড; মোনাই, বাপীদা, মনু, সনু ও পুঁটি—লেক গার্ডেন্স; বিন্দি, গাণ্ডু, পিলা, তাতু ও মিমি—কবীর রোড; মা, মিনু, পম্পা, সম্পা, শ্যামল, পিউ ও রুণু সমাদ্দার—মনসাতলা লেন; সুদেষ্ণা ও টুম্পা চক্রবর্তী—নিউ বালিগঞ্জ রোড; দ্বৈপায়ন ও স্বাতী দত্ত—রাণী হর্ষমুখী রোড; সত্যেন্দ্র, সুশান্ত, প্রশান্ত, নীলিমা ও অনিমা দাস—অশ্বিনীনগর; দীপান্বিতা, শুক্লা, লিপি, মুক্তি প্রভৃতি—বড়িষা; অভিজিৎ, অমিত, অসীম, শুক্লা প্রভৃতি—শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন; পিয়া ও অনুপ বসু—বালিগঞ্জ স্টেশন রোড; দেবব্রত রায়—প্যারীচরণ সরকার স্ট্রীট; সমীরণ, সংগীতা, অমল ও সুকুমার—গরচা ফার্স্ট লেন; বাবা, পিন্টু, বাসু, মাসী প্রভৃতি—সার্পেন্টাইন লেন; বসন্ত, আরতি, দেবাশিস ও নন্দিনী মুখোপাধ্যায়—রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট।

২৪ পরগনা—মুনমুন, মধুগীতি ও আলোক মিত্র—নিউ আলিপুর; কৃষ্ণা, কাবেরী, বাচ্চি ও মিঠু ঘোষ—উদয়রামপুর; সুদীপ্তা, সুকান্ত, সুশান্ত, সুপর্ণা ও সুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়—কাঁচড়াপাড়া; পাপু, রিঙ্কু, বুড়িয়া, বাবা ও মা—কাঁচড়াপাড়া; সাঙ্কু, টিঙ্কু ও বুকু চ্যাটার্জী—শহীদনগর; অমিতাভ, প্রগতি, সুশান্ত, ক্ষমা ও অনুপম—কাঁচড়াপাড়া; বাপি, টুকটুক, দেবাশিস, মুন্না ও ত্রিলোচন ভট্টাচার্য—ভাটপাড়া; দিদিমণি, মা, বাবা, বাপী, ভুলু ও থোকন—গোচারণ; অপূর্ব, শিবশঙ্কর, কুন্তলা ও রবি চ্যাটার্জী—বারুইপুর; সত্য, নকুল, পতিত, চিত্ত, পূর্ণ প্রভৃতি—শিরাকোল; আবীর, কেয়া, কাজল, রিঙ্কু প্রভৃতি—বারাকপুর; টুকুন, কাকু, বাবা, মা প্রভৃতি—বারাকপুর; সাধনা, কাকলী, কল্লোল, পল্লব প্রভৃতি—ভাটপাড়া; গদাই, ফুচি, বাবুয়া, পটলা, মিলু প্রভৃতি—সরকারপুল; দেবব্রত, মিতালী ও কাকলী মণ্ডল—চালুয়াড়ী; রিঙ্কু, টিঙ্কু, সঞ্জু, অঞ্জু প্রভৃতি—বারাসাত; অমিত, সুমিত, বরুণা ও তথাগত ভট্টাচার্য—ভাটপাড়া; সুপর্ণা, জয়শ্রী, হিমাদ্রী, বনানী ও তনুজা—কণ্যানগর; শান্তিময় হাজারী ও অসিতবরণ পাল—আমতলা।

হাওড়া—প্রতাপ লাহা—ইছাপুর; কল্পনা বিশ্বাস—সালকিয়া; দোলা, রাজা, তনু, কাকলী ও মুরারি—কৃষ্ণধন কর লেন; মীরা, রীতা, বিমান, কমল প্রভৃতি—শিবপুর; মহুয়া ও অমরনাথ পাল—খুরুট।

হুগলী—বাপী, মা, মিতা, ঝুনু প্রভৃতি—চুঁচুড়া; কুমু ও চুমু চক্রবর্তী—ভদ্রকালী; জোনাকী, মাম, রূপা ও বেগম—চুঁচুড়া; নিবেদিতা, নন্দিতা এবং দেবাশীস দাস—বাঁশবেড়িয়া; রীণা ও সুমিতা—শ্রীরামপুর; শুভ, সুরজিত, শঙ্কর ও বাসব—চুঁচুড়া; সিক্তা, চন্দ্রনাথ,

মা, দাদু প্রভৃতি—নারায়ণপুর ; পুপাই, জোনাকী ও বাপ্পা—রায়বাজার ; শুভ্রা দাস—চন্দননগর ; দাদু, বাবা, কাকা, নাগু প্রভৃতি—কাঁঠালগড়িয়া ; মধু, বেণু, শম্পা, সুতপা ও সুজাতা—চুঁচুড়া ; অরূপ, নাড়ু, মানু, শৈবাল প্রভৃতি—চুঁচুড়া ; টুলটুল, বুলবুল ও শ্যামল—জনাই।

বর্ধমান—মা, বাবা, নীলাঞ্জন ও তথাগত মুখোপাধ্যায়—বর্ধমান ; প্রকাশ, চন্দ্রশেখর ও বিশ্বনাথ—বার্ণপুর ; বিদিশা ও বৈশালী দাস—ডিসেরগড় ; প্রবীর, প্রণীত, প্রতীক, বাবা ও মা—বল্লভপুর ; আফরোজা সুলতানা—দুর্গাপুর-৫ ; মামু ও অমিয়—দুর্গাপুর ; মেজমামা, সেজমামা ও গৌতম ভাণ্ডারী—কামারপাড়া ; শিখা, অমির, বাপ্পা ও মিতুন—দুর্গাপুর-৬ ; অরূপ, মুনমুন, তুতুন, লাল প্রভৃতি—ডিসেরগড় ; তাপস পট্টনায়ক—দুর্গাপুর-৫ ; দীপক, মিনু, মিঠু, টুটু প্রভৃতি—মহেন্দ্র পণ্ডিত লেন ; টুকাই, পার্থ, বিটু, পাপু ও বিষ্ণু—বার্নপুর ; শিখা, কেকা, লিপিকা, পথিক ও পার্থসারথী মণ্ডল—আসানসোল ; চন্দন, বাপ্পা ও পিকু মাইতি—বর্ধমান ; বিশ্বজিৎ ও ইস্কো—বার্নপুর ; বাবা, মা, যামিনী, সন্ধ্যা প্রভৃতি—দুর্গাপুর-৫ ; প্রণব, স্বপন, তারাপদ, নীরা প্রভৃতি—বার্নপুর ; নবনীতা নন্দী—দুর্গাপুর-৫ ; বাপী, ছোটন, মুন্নু ও অশোকদা—শীতলপুর কোলিয়ারী ; মাণিক অধিকারী—সোদপুর ওয়ার্কসপ ; অমিত ও পম্পি মুখার্জী—সেন র‍্যালে ; দেব আশিস, বুনি, মঞ্জু, বাবলু প্রভৃতি—দুর্গাপুর ; ইন্দ্রাশীস ও দেবাশীস ঘোষ—দুর্গাপুর-৯ ; শর্মিলা, নীলাঞ্জনা, তন্ময় ও মাস্টারমশাই—দুর্গাপুর।

নদীয়া—ধ্রুবনাথ রায়—কৃষ্ণনগর ; লুসি, পুতুল, ব্যবুই, সোমা প্রভৃতি—কৃষ্ণনগর।

মেদিনীপুর—সিকদার, কাঞ্চন, স্বপন, রেবা প্রভৃতি—মাতকাতপুর ; মা, বাবা, টুটু, বিলু, কুমু প্রভৃতি—গোদাপিয়াশাল ; আশিস, রীতা ও বাবা—খড়্গপুর ; টুটুল, বুবুল, দোতুল ও মা—রবীন্দ্রনগর ; সুবোধ, মীরা, কল্পনা ও ফুটু বেরা—ধুলিয়াপুর ; প্রদীপ, সমীর, কাকলী, বর্ণালী প্রভৃতি—কোঁয়াই ; লাল্টু, মন্তু, শঙ্করী, বাবা ও মা—খড়্গপুর ; সুব্রত, সন্দীপ, প্রদীপ, তরুণ প্রভৃতি—গোদাপিয়াশাল।

বাঁকুড়া—বাবা, মা, অজিত, অসিত, প্রভৃতি—তিলুড়ী ; রূপালী, শিউলী, মৌসুমী, বোচন প্রভৃতি—ভক্তাবাঁধ ; সীমন্ত, হেমন্ত, অনাথ ও নিখিল মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়—মটকবনী ; বাচ্চু, ববি, বিল্টু, মা ও বাবা—লালবাজার ; অসিত ও আরবী চন্দ্র—পাত্রসায়ের ; সুকুমার চক্রবর্তী—চাঁচর ; আশামুকুল ও বেলা রায়—বিষ্ণুপুর ; বৈদ্যনাথ, সোমনাথ ও টুলু—বিষ্ণুপুর ; রাজশঙ্কর চৌধুরী—কেন্দুয়াডিহি ; টোটন, সুমিত, স্নেহাংশু, শিবাজী প্রভৃতি—মটকবনী ; অগ্রদূত তরুণসংঘ—রাউতোড়া ; সত্যনারায়ণ, শুভাশীষ ও আশীষ গাঙ্গুলী—রাউতোড়া ; সুমনা, সঞ্জয় ও সমীর সামন্ত—বাঁকুড়া ; নচিকেতা, শুভ্রচেতা, দেবানন্দ ও অরূপ—স্কুলডাঙা ; স্বপ্না, অঞ্জন, সঞ্জয়, স্বপনমামা প্রভৃতি—খাতড়া ; সুবোধ, প্রবোধ ও অশোক মুখার্জী—বড়শাল ; গোপা, আলোক, উত্তম ও প্রণব মণ্ডল—মটকবনী ; মা, দাদা, বৌদি, ক্ষমাবৌদি প্রভৃতি—ভক্তাবাঁধ ; রবীন্দ্রনাথ, মৃণাল, মৌসুমী ও পান্না—রাউতোড়া ; মহীতোষ ও সুলেখা চ্যাটার্জী—ভাড়া ; মা, বাবা, শীতল, সমীর ও মলয়—বটব্যাল ; জীবন, বীরেন্দ্র, স্বপন ও রামচন্দ্র গড়াই—আকুই ; সোনাবৌদি, উত্তম, শম্পা, সরজিৎ ও অরিজিৎ বটব্যাল—মালিয়াড়া ; মুকুল, বকুল, অনিন্দিতা, প্রেমসুন্দর ও বিশ্বদেব বটব্যাল—ভক্তাবাঁধ ; কাকু, পিসিমণি, শঙ্কু, ঝঙ্কু প্রভৃতি—ভক্তাবাঁধ ; টুটু, টুম্পা, নানা, শান্তি প্রভৃতি—লোকপুর ; বাবা, মা, প্রশান্ত, কল্যাণী ও পার্থ—মুক্তাতোড় ; দাদা, বৌদি, মেজদা, শুক্লা ও অনুপ বটব্যাল—ভক্তাবাঁধ ; বুদ্ধদেব, প্রদীপ্ত, পার্বতী, বিদ্যুৎ ও তারাপদ বটব্যাল—ভক্তাবাঁধ ; বাবু চন্দ্র ও চঞ্চল সেন—সোনামুখী ; মাণিকলাল ধীবর ও গুরুপদ আচার্য—সোনামুখী ; খোকন, বাবু, মাণিক, গুরু ও চঞ্চল সেন—সোনামুখী ; শুভ্রাংশু, সুধাংশু, হিমাংশু, সিতাংশু প্রভৃতি—মটকবনী ; রুমা, দীপ, পুপুদি ও মাস্টারমশাই—মালপাড়া ; দেবু, গুরু, মন্টু, স্বপ্না প্রভৃতি—রঘুনাথপুর ; জীবন, নব, সমীর, মণি ও শান্তিসাধন মুখোপাধ্যায়—সোনামুখী।

বীরভূম—মা, বাবা, নন্তু, সন্তু, মিতা প্রভৃতি—দুবরাজপুর ; প্রণতি অপূর্ব দাশ—শান্তিনিকেতন ; প্রবোধকুমার দত্ত—মুরারাই ; বাপি, মণি, টুটুল ও সচ্চিদানন্দ রায়—সিউড়ী ; বাবা, মা, শম্পা ও চন্দন সিনহা—আমদপুর।

পুরুলিয়া—মানা, পিকা, বাপী, বড়মামা ও তৃপ্তি ঘটক—অলঙ্গিডাঙ্গা ; অমনি, মোম, শিউলী, টুবলু প্রভৃতি—সান্তালদি ; শীতলপ্রসাদ বটব্যাল—অলঙ্গিডাঙ্গা ; বড়দা, অমিয়, নীরেন্দ্রনাথ ও হীরেন্দ্রনাথ হাজরা—ছড়রা ; দেবব্রত রায়, মা ও বাবা—নীলকুঠীডাঙ্গা ; কাকলী, ফুলমনা, রাজা ও খেয়ালী চৌধুরী—নীলকুঠীডাঙ্গা ; শ্রীরাজ, শ্যামল, মান্টু, রুমা প্রভৃতি—মানবাজার ; স্বরাজ, মহারাজ, ধীরাজ ও শ্রীরাজ চৌধুরী—মামবাজার ; দিলীপকুমার চৌধুরী—মানবাজার ; অন্নু, মিতু ও ববি—সান্তালদি ; নিমাই, সরমা, কৃপাসিন্ধু, গোকুল প্রভৃতি—পুরুলিয়া ; দাদু, অপর্ণা ও সুপর্ণা মাজী—ঝাঁপড়া ; জগদাশিষ, বংশীধর, পুণ্ডরীকাক্ষ ও শক্তিপদ—ছড়রা ; মা, বাবা, বৌদি, দাদা প্রভৃতি—রঘুনাথপুর।

মুর্শিদাবাদ—লক্ষ্মীকান্ত, ঝর্ণা, টুটুন ও মিঠু—বহরমপুর ; ঝর্ণা সুভাষ ও সুদীপ চ্যাটার্জী—রায়গঞ্জ।

দার্জিলিং—[illegible]পী, দুলুপিসী, বাচ্চুপিসী প্রভৃতি—শিলিগুড়ি ; তাপস, মৈত্রেয়ী [illegible]ল দত্ত—সোনাপুর ; শান্তিরঞ্জন রায় ও দুলাল সুর—শিলিগুড়ি ; [illegible]তা ঠাকুর ও কৌশিক ভট্টাচার্য—শিলিগুড়ি।

জলপাইগুড়ি—অপূর্ব, খোকন, অরুণ, কৃষ্ণা প্রভৃতি—নিউ ময়নাগুড়ি ; বাবুয়া, দিলীপ, সন্ধ্যা ও জ্যোতিশেখর দাস—আলিপুরদুয়ার।

বিহার—সঞ্জয়, বাবা, মা, নূপুর প্রভৃতি—রাঁচী ; শর্বরী, সর্বাণী, বিনিতা, সুনীতা ও অর্ণব পাণ্ডে—সাকচী ; তুহিন ও টুম্পা দাশগুপ্ত—জামসেদপুর-৪ ; তাপস, ডলি, লক্ষ্মী, শিবু ও তপন বোস—সুদখুরকী ; জ্যেঠু, জেঠিমা, বাবা, মা প্রভৃতি—জামসেদপুর-৩ ; নিশীথ, অসিত, তড়িৎ অমিত, বাবা ও মা—ঘাটশীলা ; টুলু বাবু, পিণ্টু, বুম্বা ও মৌসুমী চট্টরাজ—জামসেদপুর-৫ ; প্রবীর, প্রণব, হেমন্ত ও হীরেন—পাটনা-১ ; পরেশ, সুখময়, জীমূতবাহন ও প্রণতি বক্সী—বাসদেওপুর কলিয়ারী ; দুলা, কণ্টু, ওঙ্কার, গোলক প্রভৃতি—জামসেদপুর-৮ ; তনুশ্রী, রুবেন ও বনশ্রী করগুপ্ত—জামসেদপুর-৫ ; নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়—পাটনা-৪ ; সুব্রত, সমস্ত, মা ও বাবা—ডোরাণ্ডা ; গৌতম, মা, বাবা, বিবি প্রভৃতি—জামসেদপুর ; টুম্পা, জয় ও টুবু—বার্মা মাইনস ; বৃষ্টি ও রণো—রাঁচী ; মা, বাবা, দাদা, দিদি প্রভৃতি—হাজারীবাগ ; বাবুয়া, মণি, তুলতুল, পিঙ্কু প্রভৃতি—জামতাড়া ; মা, বাবা শান্তনু, অতনু প্রভৃতি—কুমারডুবি ; মানস, প্রদীপ, ত্রিদিব ও সন্দীপ সেন—জামসেদপুর।

আসাম—সুমিতা চক্রবর্তী—মিলনপুর ; বাবা, মা, দিদি জামাইবাবু—করিমগঞ্জ ; মিলটু মামপি, বাবা, মা প্রভৃতি—হাইলাকান্দি ; বাবন, বাবলী, রুবলী ও মুক্তা পুরকায়স্থ—হুগ্রীজান ; করবী, সাধন, কাজল ও মানতু—মালিগাঁও ; দেবাশীষ ও দীপক বসু—চাবুয়া ; টুকটু টিপটু ও তিষ্টু—করিমগঞ্জ ; দীপক বোস—চাবুয়া।

উড়িষ্যা—সীমা, বুলা, দীনেন, অতীন, ও বুমবাপ্পা—হীরাকুদ ; জ্যোতির্ময়, বাসন্তী, ছায়া ও পঞ্চানন—বাণ্ডামুণ্ডা নিউ কলোনী।

উত্তরপ্রদেশ—চিত্রা, পাপিয়া, জিনিয়া ও সমীর—বারাণসী।

মধ্যপ্রদেশ—তুষার, সুচরিতা, মা ও বাবা—চিরমিরি ; লিলি পাঠক ও বাপ্পাই—ধানতোলী।

টারজানের বেশে

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

শুকতারায় তো তোমরা টারজানের কাহিনী পড়ো। দারুণ না? সিনেমায় এই টারজান সাজেন কে তা জান কি? তাঁর নাম জনি ওয়ায়েজমুলার। লম্বা চওড়া বিরাট চেহারা। ঠিক যেন ঐ গল্প কথার টারজান। লম্বা ছ'ফুট চার ইঞ্চি। ঊনিশটি সিনেমায় টারজান সেজেছেন। এখন বয়েস সত্তরের ওপর। কিন্তু দারুণ ফিট-ফাট।

এই ওয়ায়েজমুলার কিন্তু খুব নামকরা সাঁতারু ছিলেন। ওলিম্পিকে গাদা গাদা পদক পেয়েছেন। তার মধ্যে সোনাই বেশী। সাঁতারে তিনি বিশ্ব রেকর্ড ভেঙ্গেছেন সাতষট্টি বার। এখনো, মানে এই সত্তর-বাহাত্তর বছর বয়সেও নিয়মিত সাঁতার কাটেন, ব্যায়াম করেন।

টারজান হিসেবে নয়, ওয়ায়েজমুলার সাঁতারু হিসেবেই নিজেকে ভাবতে ভালবাসেন। সিনেমার কথা উঠলেই হাসেন। বলেন, "ও সব অভিনয়-টভিনয় আমি জানতামই না। লম্বা চওড়া বিরাট চেহারা ছিল আমার, আর ছিল বুনো বুনো ভাব। ব্যাস—সাঁতারু থেকে হয়ে গেলাম সিনেমার নায়ক।

টারজান বেশে সাঁতার কাটতাম, গাছে চড়তাম, লাফাতাম, মারামারি করতাম। সত্যি সত্যি টারজানই হয়ে গিয়েছিলাম আমি। সাঁতারু থেকে টারজান—কি মজা না?"

কথাগুলো বলেই এখনো ঊনিশটি ছায়াছবির টারজান জনি ওয়ায়েজমুলার হেসে ওঠেন। আর ওঁকে দেখলে এখনো রাস্তায় ভিড় জমে। এতো বয়সেও অতো সুন্দর চেহারা তো একমাত্র টারজানেরই হতে পারে। রাস্তায় তাঁকে দেখলে বাচ্চারা বলে, জামা কাপড় পরে টারজান চলেছে। আর বড়রা বলেন, গুড মর্নিং লর্ড গেস্টিক...

ফুটবল এসে গেলো

গরম পড়ে গেছে। বিল্টু-মন্টুরাও তাই ক্রিকেটের ব্যাট-বল ছেড়ে এখন ফুটবল ধরেছে। পাড়ার গলি আর পার্কে শুরু হয়ে গেছে মোহন-বাগান ইস্টবেঙ্গলের খেলা। তবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে তো এখনো ভারতের সঙ্গে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট ম্যাচ চলছে—তাই ওরাও ছাড়ি ছাড়ি করে ক্রিকেটটা পুরো ছাড়তে পারছে না। বিকেলের দিকে ওদের মধ্যেও ভারত-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট খেলা চলছে মাঝে মধ্যে।

এই খেলা নিয়েই সেদিন গোলমাল বাধলো। পাড়ার মেয়েরা—তাদের মধ্যে বিল্টু-মন্টুদের ছোড়দিও ছিল, এসে বললো, তোদের চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, আমাদের সঙ্গে খেল।

মহা মুশকিল! চ্যালেঞ্জ ছাড়াও যায় না। আবার ওদের সঙ্গে খেলতেও ইচ্ছে করে না। যদি হেরে যায়। বলা তো যায় না। শংকরের বোন স্বাতী আবার বাঙলার হয়ে মেয়েদের ক্রিকেটে খেলে। এবার নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে আর একটু হলেই নাকি টেস্ট খেলতো।

তাই ওদের খুব একটা ইচ্ছে করছিল না মেয়েদের সঙ্গে খেলতে। এই নিয়ে যখন ওদের মধ্যে জোর তর্ক চলছে তখনই ভণ্টের একটা তোল্লা বল পেয়ে বিল্টু সপাটে মারলো। বলটা গিয়ে সোজা লাগলো নণ্টুর বড়দার গায়। অফিস

ছেলেদের সঙ্গে তাল দিয়ে মেয়েরাও এখন ক্রিকেট খেলছে। এ বছর নিউজিল্যাণ্ডের মেয়েরা ভারতের সঙ্গে টেস্ট খেলতে এসেছিলেন। কলকাতায় হয়েছিল ভারত নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম প্রমীলা টেস্ট। সে খেলার মীমাংসা হয় নি।

থেকে ফিরছিলেন তিনি। দারুণ রাগী লোক। তাই দেখে নণ্টু তো সবার আগে ছুট লাগালো। তার পেছনে ওরা সকলে। কি দরকার বাবা বকুনি খাবার! ব্যাট-বল ওরা হাতে নিয়েই ছুটেছে। গলিতে পড়ে রইলো ক'খানা ইঁট। সেগুলো দিয়ে ওরা উইকেট বানিয়েছিল। আর বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলো পাড়ার মেয়েরা। ওদের আর খেলা হলো না!

ছুটতে ছুটতে একেবারে পার্কে এসে তবেই থামলো ওরা। ঘেমে নেয়ে উঠেছে সকলে। দারুণ হাঁপাচ্ছে। আর বিল্টুকে যা তা বলছে। বলবেই তো। বিল্টুর জন্যেই যে ওদের বিকেলের খেলাটা মাটি হয়ে গেলো। বিল্টু অমনি ফোঁস করে উঠলো, "হ্যাঁ, আমার জন্যে ওঁদের খেলা হলো না। ওখানে খেললে যে ছোড়দিদের সঙ্গে খেলতে হতো।"

"না হয় খেলতাম ওদের সঙ্গে।"

"যদি হারিয়ে দিতো!"

এবার ওরা সকলে চুপ। সত্যি যদি মেয়েদের কাছে ওরা হেরে যেতো তাহলে কি হতো। আর কি মুখ দেখানোর জো থাকতো? সকলে তাই মনে মনে মেনে নিলো, বিল্টু ভালোই করেছে। এক ঐ নণ্টু ছাড়া। ও বেচারা মুখ শুকিয়ে বসে আছে। বাড়ি গেলে বড়দার সামনেই যে আগে পড়তে হবে·····।

সেদিন স্কুলে বিল্টু-মণ্টুরা খুব হৈ-চৈ করছিল। ফুটবল আসছে তো—ওদের আলোচনা হলো কোন্ দল কেমন হলো তাই নিয়ে। মোহনবাগানের শক্তি এবার অনেক বেশী—ইস্টবেঙ্গলও কম যায় না·····এই সব নিয়ে তর্ক।

হঠাৎ নণ্টে বলে উঠলো, "খুব তো খেলা খেলা করছিস—বল তো, ডাইরেক্ট ফ্রি কিক্ কখন হয়?"

কেউ পারলো না। তখন সকলে মিলে চললো ড্রিল স্যার অজয়বাবুর কাছে। সব শুনে-টুনে অজয়বাবু বললেন,

"কোন খেলোয়াড় যদি ইচ্ছে করে নীচের ন'টি দোষের মধ্যে যে কোন একটি করে তাহলে রেফারী তার বিরুদ্ধে ডাইরেক্ট ফ্রি কিকের নির্দেশ দেবেন—

১) কোন খেলোয়াড় যদি প্রতিপক্ষ দলের কাউকে লাথি মারে বা লাথি মারার চেষ্টা করে ;

২) কেউ যদি বিরোধী পক্ষের কাউকে প্যাঁচ মেরে ফেলে দেয় ;

৩) কোন খেলোয়াড় যদি প্রতিপক্ষ দলের কোন খেলোয়াড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে ;

৪) কোন খেলোয়াড় যদি প্রতিপক্ষকে বিপদ-জনকভাবে বা হিংসাত্মকভাবে চার্জ করে ;

৫) যদি কোন খেলোয়াড় প্রতিপক্ষ দলের কাউকে পেছন থেকে চার্জ করে ;

৬) যদি কোন খেলোয়াড় বিরোধী পক্ষের কাউকে আঘাত করে বা আঘাত করার চেষ্টা করে ;

৭) কেউ যদি প্রতিপক্ষ দলের কোন খেলোয়াড়কে হাত বা অন্য কিছু দিয়ে ধরে বা ধরার চেষ্টা করে ;

৮) কেউ যদি বলে হাত দেয় (সীমানার মধ্যে থাকা গোলরক্ষক ছাড়া)—যেমন হাত দিয়ে বল ঠেলে দেয় বা হাত দিয়ে তুলে নেয় ;

৯) কোন খেলোয়াড় যদি হাত দিয়ে বা বাহু দিয়ে প্রতিপক্ষ দলের কোন খেলোয়াড়কে ঠেলে দেয় বা ধাক্কা মারে।"

এতো সব ওরা জানতো না। অজয়বাবুর কাছে শুনে হইহই করতে করতে ক্লাসে ফিরে গেলো। ততোক্ষণে টিফিনও শেষ। এবার আবার হেড স্যারের ক্লাস। ওরা সব চুপচাপ গিয়ে বই-টই নিয়ে ক্লাসে ভালো ছেলের মতো বসে পড়লো। তা ছাড়া উপায়ই বা কি। গোলমাল করবে —সে সাহস ওদের নেই। হেড স্যার যা রাগী···

গত মাঘ সংখ্যার নির্ভুল বাকি উত্তরদাতাদের নাম

মেদিনীপুর—অরুন্ধতী চক্রবর্তী—হলদিয়া ; গোপলু, জগন, অনুভব, মান্টু, চন্দন প্রভৃতি—মহিষাদল।

বাঁকুড়া—দাদা, বৌদি, দেবকল্যাণ, দেবব্রত ও শুক্লা বটব্যাল—ভক্তাবাঁধ ; বুদ্ধদেব, প্রদীপ্ত, তারাপদ, পার্বতী, বারিদ, সাধনা ও আরাধনা—ভক্তাবাঁধ ; বাবু, মা, মাণিক, বিদ্যুৎ ও তারাপদ বটব্যাল—ভক্তাবাঁধ ; কাকু, পিসীমণি, উত্তম, সুরজিৎ, অরিজিৎ, শম্পা, শঙ্কু ও ঝঙ্কু বটব্যাল—ভক্তাবাঁধ ; শৈলেন, দিলীপ, কল্যাণ ও সমর—ভৈরবপুর ; মুকুল, বকুল, অনিন্দিতা, প্রেমসুন্দর ও বিশ্বদেব বটব্যাল—ভক্তাবাঁধ ; টুটু, টুম্পা, নানা ও শান্তি—লোকপুর ; বাচ্চু, ববি, মা, বাবা ও বিন্টু—বাঁকুড়া ; বাসুদেব, লালমোহন, জগন্নাথ, সলিল, সুধীর প্রভৃতি—উখড়াডিহি ; শুভ্রাংশু, সুধাংশু, হিমাংশু, সিতাংশু ও স্নেহাংশু মণ্ডল—মটুকবণী ; সরল সঙ্গোপাধ্যায় ও প্রণব মণ্ডল—মটুকবণী ; অনাথবন্ধু, সীমন্ত, হেমন্ত, তাপসী ও নিখিলমণ্ডল চট্টোপাধ্যায়—মটুকবণী ; মিঠু, মিনু, ডলি ও খোকন—ধামুড় ; স্নেহাংশু, সুমিত, টোটন, শিবাজী, বীর ও রাক্ষসমামু—মটুকবণী ; জ্যোতির্ময়, দেবাশীষ ও বনানী গঙ্গোপাধ্যায়—রাউতোড়া ; সত্যনারায়ণ, শুভাশীষ, সতীশ প্রভৃতি—রাউতোড় ; সুলেখা, হাবুদি, রাজু, বুবাই ও মহীতোষ চ্যাটার্জী—ভাড়া ; মা, বাবা, বৌদি, দ্বিজদাস ও সন্তদাস বটব্যাল—ভক্তাবাঁধ ; আরতি, কৃষ্ণা, সুবল, কেবু ও টুকু—তিলুড়ী ; রূপালী, শিউলী, মৌসুমী, প্রদীপ, সুদীপ ও সন্দীপ বটব্যাল ভক্তাবাঁধ ; মা, বাবা, শীতল, সমীর ও মলয় বটব্যাল—ভক্তাবাঁধ ; পারু ও পার্বতীচরণ বটব্যাল—ভক্তাবাঁধ ; পুষ্প, লক্ষ্মী, চায়না ও তুলতুল—তিলুড়ী।

বিহার—দাদা, বৌদি, গীতা ও রীতা নামাতা—বার্মামাইন্স্ ; টুম্পা, মানি, মাসীমণি, বাবা ও মা—জামসেদপুর ; তনুশ্রী, রুবেন ও বনশ্রী করগুপ্ত—জামসেদপুর-৫ ; মানস ও ত্রিদিব সেন—জামসেদপুর ; বাবলা ও ফাল্টুস বরাট—ধানবাদ ; গীতি, বুলা ও মুনমুন—কাটিহার ; পরেশ, সুখময়, জীমূত ও প্রণতি বক্সী—বাসুদেবপুর কলিয়ারী ; জুলকু, অরুণ, দীপা, মা ও বাবা—পাটনা ; বিজু, কনু, দ্বিপু ও নিপু—জামসেদপুর-১ ; বাবা, মা, রাজু ও রামা—বিষ্টুপুর ; বাচ্চু, মনু, মামুন ও রূপা—টেলকো ; প্রণব, প্রবীর, বাবা ও মা—পাটনা-১ ; মঞ্জু, অঞ্জু ও ইতি চট্টোরাজ—জামসেদপুর-৩ ; শর্বরী, সর্বাণী, বিনীতা, সুনীতা ও অর্ণব পাণ্ডে—সাকচী ; সুব্রত, সরকার—ধানবাদ ; সমীর, মৃদুলা, মানস, বৈশাখী সেনগুপ্ত—জামসেদপুর-৪।

আসাম—লিপি ব্যানার্জী, রাণা, মা ও বাবা—গৌহাটী ; সোমা, রুমা, বাসু, মিতু, শম্পা, সোনাই ও বুবুন—গৌহাটী ; রাণা, সুমিত, রতন, বিপ্লব বিজয় প্রভৃতি—লিডু।

নতুন দিল্লী—পারমিতা ঘোষ—গ্রীণ পার্ক।

ছোটদাদুর প্রয়াণে

(শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদারের পরলোকগমনে শোকাভিভূত ডাঃ ভবানীপ্রসাদ চক্রবর্তী।)

অত্যন্ত আকস্মিকভাবে জানলাম আমার ছোটদাদু শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার আর ইহলোকে নাই। গত ২৪শে মার্চ বুধবার রাত্রি নটা পনেরো মিনিটে পৃথিবীর সব হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে তিনি পাড়ি দিয়েছেন চির অজানা অনন্তলোকে। একটা বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্ণধার হয়ে অসামান্য কর্মদক্ষতার যে পরিচয় তিনি রেখে গেছেন, কর্মীবৃন্দ এবং পরিচালকবর্গ তাঁর বিদায়ের বহুদিন পরও সে উপলব্ধি বহন করবে এবং তাঁর অভাববোধ আত্মীয়স্বজনকে দীর্ঘকাল উদ্বেল রাখবে তাতে কোন সন্দেহই নাই। তবে ব্যক্তিগতভাবে ছোটদাদুর এই প্রয়াণ আমার কাছে একান্ত বেদনাবহ।

ছোটদাদুর সঙ্গে আমার পরিচয় স্বল্পকালের। মাত্র কয়েক বছর তাঁর কর্মময় জীবনের সামান্য কিছুটা আমি দেখেছি এবং জেনেছি। তাঁর ব্যক্তিত্ব অন্য সকলের মত আমাকেও আকর্ষণ করত। সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিল তাঁর অনুসন্ধিৎসা আর জ্ঞানপিপাসা। বর্তমান পৃথিবীতে প্রচলিত জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি শাখায় ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। জীবনের শেষ অধ্যায়ের প্রান্তে এসেও তাঁকে দেখেছি আধুনিক সব তত্ত্ব এবং তথ্যকে আত্মসাৎ করার ক্লান্তহীন প্রচেষ্টা। অনেক জ্ঞানী তাঁর সঙ্গে কথা বলতে সেজন্য সমীহ করতেন। জ্ঞানগর্ভ বিষয়ে কথা বলতে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। আর এই ব্যাপারেই আমার সঙ্গে তাঁর আলোচনা হত অনেক দিন সময়সীমা আর পার্থিব জগতের সব কিছুকে উপেক্ষা করে। অনেক কাজের মধ্যে এতে তিনি বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করতেন আর আমার পক্ষে সে ছিল একটা পরম সুখ, যা থেকে ভাগ্যহীন লেখক চিরতরে বঞ্চিত হল।

প্রজ্ঞার পাশাপাশি একটা চিরচঞ্চল শিশু-সুলভ আচরণ তাঁর চরিত্রে অকৃত্রিম বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছিল। পরিণত বয়সেও ছোটদের সঙ্গে খেলতে বসে তিনি বিভোর হয়ে যেতেন। বার্ধক্য তাঁর দেহমনে কখনও জরার প্রলেপ আঁকতে পারেনি। এক চির কিশোরের লাবণ্য তাঁকে সবুজ করে রেখেছিল। ছোটদের বহু পত্র-পত্রিকার প্রকাশে তার প্রতিফলন অক্ষয় হয়ে থাকবে।

জীবনের সব কাজই তিনি দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করতেন। কোন কাজ ফেলে রাখা তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। অনেক সময় এটা অকারণ কর্মব্যস্ততা মনে হলেও তাঁর বৈষয়িক সাফল্য প্রমাণ করেছে, এটাই জীবনের সঠিক পদক্ষেপ। তাঁর এই অভ্যস্ত দ্রুততা, শুধু জীবনেই নয়, চকিত মৃত্যুতেও তিনি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

এই কিছুদিন আগে হঠাৎ তিনি জ্যোতির্বিদ্যার চর্চায় মেতে উঠেছিলেন। বিভিন্ন গ্রন্থের সাহায্যে নানা জন্মকুণ্ডলীর ভবিষ্যৎ উন্মোচনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জল্পনা করতেন। জানি না তারই ফাঁকে কোন ইঙ্গিত পেয়েছিলেন কিনা, এই সমাসন্ন শেষ লগ্নের। বিশ্রামের জন্য গিয়েছিলেন বিহারের বিশ্রামকুঞ্জে। ফিরে এসে যাত্রা করলেন অনন্তলোকে।

ছোটদাদু আর নাই। কিন্তু আমরা তাঁকে ভুলতে পারব না। তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

ছোটরা যখন ছোটো থাকে...

তখন তো তাদের দুরন্ত হওয়াই স্বাভাবিক। আর যারা স্বভাবতই শান্ত তারাও তো কখনো সখনো দুরন্তপনা করে। খেলাতে গিয়ে অন্য সবায়ের মতো তারাও হাত-পা কেটে ফেলে। শরীরের নানা জায়গা তাদেরও ছড়ে যায়। ঘষা লাগে।

এইসব কাটা-ছেঁড়া-ফাটা-ঘষালাগা জায়গাগুলো দূষিত হ'য়ে উঠতে কী খুব সময় লাগবে। কারণ ধুলো-বালির নোংরা ধুলেও সহজে যায় না। তাই **বোরোলীন** হাতের কাছে রাখতে পরামর্শ দেওয়া।

বোরোলীন

ব্যবহারের অভ্যাস ছেলেবেলা থেকেই গ'ড়ে তোলা ভালো। দুরন্তপনার দিনগুলো থেকেই জানতে হবে, ছোটোবেলার দুষ্টুমির চিহ্নগুলো যাতে দূষিত না হ'য়ে ওঠে, যাতে ত্বক সুস্থ, সবল, স্বাভাবিক ও মালিন্যমুক্ত থাকে তারজন্য সুরভিত

অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম **বোরোলীন**

ব্যবহার করাই নিরাপদ।

জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাঃ লিমিটেড

বোরোলীন হাউস, ১ গিরীশ এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০ ০০৩